খোরাসান থেকে কালো পতাকা

“ খোরাসান থেকে কাল পতাকা বের হয়ে আসবে, তাদেরকে কেউই থামাতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা জেরুজালেমে পোঁছে। ”

আন্দোলনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

১৯৭৯ – ২০১২ +

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম) বলেন,

"যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে যাবে তখন মুসলিমদের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। আর তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী সত্যবাদী হবে তার স্বপ্ন বেশী সত্য হবে। আর মুসলিমদের স্বপ্ন নবুওয়াতের পঁয়তাল্লিশ ভাগের এক ভাগ। স্বপ্ন তিন ধরনের। তার মধ্যে একটি হল ভাল স্বপ্ন যা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুখবর। দ্বিতীয় হচ্ছে খারাপ স্বপ্ন যা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তৃতীয় প্রকারের স্বপ্ন হল নিজের মনের চিন্তা। .... "

(সহিহ মুসলিম, ৭ম খণ্ড, স্বপ্নের অধ্যায়, ৫৭৪০ নাম্বার হাদিস)

"এবং কাফিররা পরিকল্পনা করে, কিন্তু আল্লাহও পরিকল্পনা করে। আর আল্লাহই হল সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী।"
(সূরা আল ইমরান : ৫৪)

খোরাসান : একটি ভুমি যা হল সংকীর্ণ গিরিপথ বিশিষ্ট পাহাড়ি ভুমি, বিশাল উন্মুক্ত স্থানযুক্ত, ঘন বন বিশিষ্ট, রয়েছে অনেক গুহা এবং পৃথিবীর ছাদ খ্যাঁত পামির গোলকধাঁধা , যা মধ্যবর্তী দেশগুলোর কাছে তাদের গোপন দরজা উন্মোচন করে দিয়েছে।

বিশাল সৈন্য প্রতিরোধের জন্য রয়েছে সংকীর্ণ গিরিপথ বিশিষ্ট পাহাড়ি ভুমি।

সৈন্যদের দৃষ্টিগোচর করার জন্য ও তাদের লুকানোর কোন জায়গা না দেওয়া র জন্য রয়েছে বিশাল উন্মুক্ত স্থান।

ঘন বনগুলো নিজস্ব সৈন্য ও অস্ত্র লুকিয়ে রাখার জন্য ব্যাবহার করা যায়।

এবং বিস্ময়কর পামির গোলকধাঁধা হল মুজাহিদিনদের এলাকা যেখানে তারা লুকতে পারে, পুনরায় নিজেদের মধ্যে সংঘটিত হতে পারে অথবা সহজেই তাদের নিজ পছন্দ অনুযায়ী দেশে চলে যেতে পারে কোন সীমান্ত ছাড়াই।

এই ভুমিকেই আল্লাহ্‌ শেষ যুগের যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহনের জন্য মনোনীত করেছেন।

অধ্যায় ৩ : (২০০১-২০০৫)

অধ্যায় ৪: পাকিস্তান (২০০২-২০০৫)

অধ্যায় ৫ : নতুন বন্ধু (২০০৫-২০১২)

অধ্যায় ৬ : বিশ্বব্যাপী পণ্য সরবরাহ রুট অবরোধ (২০০৬+)

অধ্যায় ৭ : আরব বসন্ত (২০১১ +)

অধ্যায় ৮ : ওসামাকে হত্যা করা হল

অধ্যায় ৯ : নিকট ভবিষ্যতে যা হতে পারে (২০১২+)

অধ্যায় ১০ : (স্পেশাল)

ম্যাপ

ভুমিকা

<u>ছেলেটির স্বপ্ন</u>

এই কাহিনীর শুরুটা হয়েছিলো ১৯৬০ সালে, ওসামা নামের ছোট্ট একটা ছেলের দেখা একটা স্বপ্নের মাধ্যমে।

ইয়েমেনি বাবা আর সিরীয় মায়ের সন্তান ওসামার জন্ম সাউদী আরবে- তিনটি ভূখণ্ডই ইসলামের পবিত্র ভূমি। শৈশব ও কৈশোরের পুরোটা সময় জুড়েই ওসামা ছিল একজন ভাল মুসলিম। সে ছিল পিতা-মাতার বাধ্য সন্তান, সমবয়সী অন্যান্য ছেলেদের মতো খেলাধূলা করার চাইতে ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করার ব্যাপারেই সে বেশি আগ্রহী ছিল।

একজন ইসলামের শিক্ষার্থী থেকে বর্ণিতঃ

আমি মাদিনা-আল মুনাওয়ারা তে একজন শায়খের বাসায় ছিলাম যিনি রাসূল (সাঃ) এর মাসজিদে খুতবা দিতেন। আমরা যখন উনার বাড়িতে পৌঁছালাম তখন কেউ একজন দরজায় কড়া নাড়ল। শায়খ দরজা থেকে এমন একজন ব্যক্তিকে নিয়ে ফেরত এলেন যাঁর বয়স প্রায় ৮০ বছর কিন্তু তাঁর চেহারা ছিল আলোকোজ্জ্বল ও সম্মানীয়।

বাড়ির কর্তা তাঁকে স্বাগত জানালেন আর তাঁকে কুরআনের কিছু আয়াতের তাফসীর করতে অনুরোধ করলেন । অতিথি শায়খ কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে সেগুলোর তাফসীর শোনালেন। আমরা নিঃশব্দে তাঁর কথা শুনছিলাম; আল্লাহর কসম, আমি জীবনে কুরআনের অনেক তাফসীর পড়েছি কিন্তু এই শায়খ ছিলেন জ্ঞানগর্ভ মানুষ। যখন তাঁর কথা বলা শেষ হল, তখন বাড়ির কর্তা তাঁকে খেতে অনুরোধ জানালেন,কিন্তু তিনি বিনয়ের সাথে তা প্রত্যাখান করলেন। এবং তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে তিনি রোযা রেখেছেন।

এরপর অতিথি চলে যাওয়ার কথা বললেন, কিন্তু নিমন্ত্রণকর্তা অনড় হয়ে বললেন , “আপনি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের কাছে আরেকবার শায়খ ওসামা বিন লাদেনের স্বপ্নটা বর্ণনা না করবেন, ততক্ষণ আপনাকে যেতে দেওয়া হবে না।”

অতিথি হেসে ফেললেন আর জিজ্ঞেস করলেন, “ সেই স্বপ্নের কথা বলছ যা শায়খ ওসামা বিন লাদেন ৯ বছর বয়সে দেখেছিলেন?”

নিমন্ত্রণকর্তা হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলেন।

এরপর অতিথি-শায়খ সেই স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলেনঃ

“আমি ছিলাম ওসামা বিন লাদেনের বাবা মুহাম্মাদ বিন লাদেনের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি বহুদিন তার কর্মক্ষেত্র, তার কোম্পানিতে গিয়েছি। আবার অনেক দিন কন্সট্রাকশন এর কাজের ব্যাপারে আমি তার বাসায়ও গিয়েছি। আমাদের আলোচনার মাঝে প্রায়ই তার সন্তানদের খেলাধুলার কারণে বিঘ্ন ঘটত। তখন তিনি তাদেরকে বাইরে গিয়ে খেলতে বলতেন।

কিন্তু আমি অবাক হয়ে যেতাম এটা দেখে যে তিনি তার একজন পুত্রকে সবসময় তার পাশে বসে থাকতে বলতেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘আপনি তাকে আপনার অন্য সন্তানদের সাথে খেলতে পাঠান না কেন? ও কি অসুস্থ?’

মুহাম্মাদ বিন লাদেন হাসলেন এবং উত্তর দিলেন, ‘না, আমার এই ছেলের মাঝে বিশেষ কিছু একটা আছে’।

আমি ওর নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ‘ওর নাম ওসামা আর ওর বয়স ৯ বছর। আপনাকে আমি কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা বলিঃ আমার এই পুত্র ফযরের সালাতের কিছুক্ষণ আগে আমাকে জাগিয়ে তুলে বলল, ‘বাবা আমি আপনাকে কিছুক্ষণ আগে আমার দেখা স্বপ্ন সম্পর্কে বলতে চাই।’ আমি ভাবলাম সে হয়তো কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছে। আমি ওযু করে নিলাম এবং তাকে আমার সাথে মসজিদে নিয়ে গেলাম।

যাওয়ার পথে সে আমাকে জানালো, ‘স্বপ্নে আমি নিজেকে একটা বড় সমতল এলাকায় দেখতে পেলাম। আমি দেখলাম সাদা ঘোড়ার সওয়ার হয়ে একটা সৈন্যবাহিনী আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের সবার মাথায় ছিল কালো পাগড়ী। উজ্জ্বল চোখের একজন সৈন্য আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি ওসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদেন?’ আমি উত্তর দিলাম- ‘হ্যাঁ’ । এরপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি ওসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদেন?’ আমি আবারও উত্তর দিলাম, ‘হ্যাঁ, আমিই সে।‘ তিনি আবারও আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি ওসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদেন?’ আমি বললাম, ‘আল্লাহর কসম, আমি ওসামা বিন লাদেন।‘ তিনি আমার দিকে একটি পতাকা এগিয়ে দিয়ে বললেন, ‘ এই পতাকাটি আল-কুদসের প্রবেশপথে ইমাম মাহদী মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহর হাতে তুলে দিও।’ আমি তার হাত থেকে পতাকাটি নিলাম এবং দেখলাম যে সৈন্যবাহিনীটা আমাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে।

মুহাম্মাদ বিন লাদেন বললেন, আমি এটা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু ব্যবসার কাজের ব্যস্ততায় আমি এই স্বপ্নের কথা ভুলে গেলাম। পরের দিন সকালেও ওসামা ঠিক ফযরের সালাতের আগে আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল এবং একই স্বপ্নের কথা বর্ণনা করল। তৃতীয় দিন সকালেও একই ঘটনা ঘটল। এবার পুত্রের জন্য আমার দুশ্চিন্তা হতে শুরু করলো। আমি তাকে একজন ইসলামীজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি যিনি স্বপ্ন ব্যাখ্যা করতে পারেন, তার কাছে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি ওসামাকে একজন ইসলামীজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে নিয়ে গেলাম এবং তাকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বললাম। তিনি অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, ‘এই কি আপনার সেই সন্তান

যে স্বপ্নটা দেখেছে?' আমি বললাম,'হ্যাঁ'। তিনি কিছুক্ষণ ওসামার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। আমি আরও চিন্তিত হয়ে পড়লাম। তিনি আমাকে প্রবোধ দিলেন এবং বললেন, 'আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব। আমি নিশ্চিত আপনি সততার সাথে সেগুলোর উত্তর দিবেন।'

তিনি ওসামাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা, ঘোড়সওয়ার সৈন্যটি তোমাকে যে পতাকা দিয়েছিল তোমার কি সেটার কথা মনে আছে?' ওসামা উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, আমার মনে আছে।'

তিনি ওসামাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'পতাকাটি কেমন ছিল তুমি কি তা বর্ণনা করতে পারবে?'

ওসামা বলল, 'ওটা দেখতে সৌদি আরবের পতাকার মতই ছিল, কিন্তু সবুজ নয় বরং কালো রঙের। আর ওটার উপরে সাদা রং দিয়ে কিছু একটা লিখা ছিল।'

এরপর তিনি ওসামাকে পরের প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি কখনো নিজেকে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখেছ?' ওসামা উত্তর দিল, 'আমি প্রায়শই এমন স্বপ্ন দেখি।' এরপর তিনি ওসামাকে ঘর থেকে বাইরে যেতে বললেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করতে বললেন।

এরপর তিনি আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার পূর্বপুরুষ কোথা থেকে এসেছে?'

আমি উত্তর দিলাম, ' ইয়েমেনের হাদরামাউত থেকে।' এরপর তিনি আমাকে আমার গোত্র সম্পর্কে আরও কিছু বলতে বললেন। আমি তাকে জানালাম যে আমরা শান্‌ওয়াহ্‌ গোত্রের সাথে সম্পর্কিত যা কিনা ইয়েমেনের একটি কাহতানী গোত্র। এরপর তিনি উচ্চস্বরে তাকবীর দিলেন এবং ওসামাকে কাছে ডেকে কাঁদতে কাঁদতে তাকে চুম্বন করলেন। তিনি আরও বললেন যে শেষ দিবসের লক্ষণগুলো প্রকাশিত হতে শুরু করেছে।

'ও মুহাম্মাদ বিন লাদেন, আপনার এই পুত্র ইমাম মাহদীর জন্য এবং ইসলামকে রক্ষা করার জন্য একটি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করবে। সে খোরাসানে (আফগানিস্তান) হিজরত করবে। ও ওসামা! যে ব্যক্তি তোমার পাশে থেকে জিহাদ করবে সে সৌভাগ্যবান। আর যে ব্যক্তি তোমাকে ত্যাগ করবে এবং তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে সে সর্বনাশগ্রস্ত ও হতাশ হবে।' ”

অধ্যায় ১ : ১৯৭৯- ১৯৮৯ – এক নতুন ইসলামিক শতাব্দী

<u>রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদ</u>

“কে অধিক শক্তিশালী, আল্লাহ নাকি রাশিয়া?’ - আফগানিস্তানে মুজাহিদিনদের অনুপ্রেরনা দিতে গিয়ে আব্দুল্লাহ আযযাম।

১৯৭৯ ছিল হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম বছর। রাসূল [সাঃ] এর একটি হাদীস অনুযায়ী প্রতি শতাব্দী পর পর আল্লাহ তাঁর পছন্দনীয় ব্যক্তিদের (মুজাদ্দিদ) মাধ্যমে দ্বীন ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।

“ প্রতি শতাব্দীর শুরুতে আল্লাহ এই উম্মাহ থেকে একজন মানুষকে উত্থিত করবেন যে দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করবে।” (সুনান আবু দাউদ, কিতাব ৩৭, কিতাব আল মালাহীম, হাদীস নন-৪২৭৮)

১৯২৪ সালে উসমানী খিলাফাতের পতনের পর থেকেই ইসলামের জন্য এক পুনঃজাগরণের প্রয়োজন ছিল । আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট রাশিয়ার যুদ্ধ হয়ে ওঠে এই বহু প্রতীক্ষিত পুনঃজাগরণের কারণ।

আফগানিস্তানে মুসলিম উম্মাহর এই পুনঃজাগরণ, এই পুনরুত্থান ঘটেছিল দুজন ব্যক্তির মাধ্যমে - আব্দুল্লাহ আযযাম এবং ওসামা বিন লাদেন।

আব্দুল্লাহ আযযাম

আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযাম

টাইম ম্যাগাজিন আব্দুল্লাহ আযযামকে অভিহিত করেছিল " বিংশ শতাব্দীতে জিহাদের পুনঃজাগরনের রূপকার" – বলে। দখলদারিত্বের ভেতরে জীবনযাপন করার প্রকৃত রূপ কি তা ফিলিস্তিনে জন্ম নেওয়া আব্দুল্লাহ আযযামের খুব ভালোভাবেই জানা ছিল। অল্প বয়স থেকেই আব্দুল্লাহ আযযাম ছিলেন চিন্তাশীল এবং কর্তব্যপরায়ণ। এই কর্তব্যপরায়ণতাই তাঁকে উদ্ভুদ্ধ করেছিলো ষাটের দশকে জর্ডান থেকে ইসরাইলের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের জিহাদে যোগ দিতে।

কিন্তু তৎকালীন ফিলিস্তিনের বিদ্রোহীদের-এর অধিকাংশই ছিলো জাতীয়তাবাদী, যারা ইসলামকে একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করতো না। আল্লাহ্‌র ইবাদাত করার বদলে তাঁদের সময় কাটতো তাস খেলে আর গান শুনে। এ সব কিছুই ছিলো আব্দুল্লাহ আযযামের অপছন্দনীয়।

একদিন কথাচ্ছলেই তিনি এক সহযোদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন – ফিলিস্তিনের এই বিপ্লবের ধর্ম কি – যার জবাবে যোদ্ধাটি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং রুঢ়ভাবে তাঁকে জানিয়ে দিলো – এই বিপ্লবের কোন ধর্ম নেই।

এই ঘটনার পরে ফিলিস্তিনের তৎকালীন বিপ্লবের উপর থেকে তাঁর মন পুরোপুরিভাবে উঠে গেলো। তিনি সৌদি আরবে চলে গেলেন সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকতা করার উদ্দেশ্যে।

আফগান জিহাদের ডাক শোনামাত্রই তিনি ছুটে গিয়ে সেই ডাকে সাড়া দিলেন। এবং পরবর্তীতে তাঁর সমস্ত জীবন, তাঁর সমস্ত অস্তিত্বকে উৎসর্গ করলেন মুসলিম উম্মাহকে এই জিহাদের দিকে আহ্বান জানানোর জন্যে। তিনি শপথ করেছিলেন কোন ভাবেই জীবিত অবস্থায় আফগানিস্তানের মাটি ছেড়ে না যাবার। তাঁর আশা ছিলো আফগানিস্তানের মাটিতে আল্লাহ্‌র আদেশ অনুযায়ী ইসলামীক খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করার অথবা শাহাদাতের।

আফগান জিহাদে যোগ দেওয়ার জন্য সমগ্র বিশ্ব থেকে আগত মুজাহিদদের সাহায্য করা ও সহযোগিতা দেবার লক্ষ্যে ওসামা বিন লাদেনের সাথে মিলে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন "বাইত আল আনসার" (সাহায্যকারীদের আবাস)।

আফগান জিহাদের প্রতি মুসলিম উম্মাহকে আহ্বান জানানোর জন্য তিনি ছুটে গেলেন বিশ্বের এক কোণা থেকে আরেক কোণায়। সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে তিনি মুসলিমদের বলতে শুরু করলেন ইসলাম ও মুসলিম ভূমি রক্ষার উদ্দেশ্যে একত্রিত হবার পবিত্র দায়িত্বের কথা। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো তাঁর জিহাদের দাওয়াত। জিহাদের উপরে তিনি বেশ কিছু বইও লিখেছিলেন – যেমন, **Join the Caravan**, **Defense of Muslim Lands**, **A Message to Every Youth** ইত্যাদি. (তাঁর অনেক বইয়ের বাংলা অনুবাদও হয়েছে)।

এসময় তাঁর বয়স চল্লিশের উপরে হওয়া সত্ত্বেও তিনি সক্রিয়ভাবে সরাসরি আফগান জিহাদে অংশগ্রহন করেন। জিহাদের উদ্দেশ্যে তিনি ছুটে বেড়ান সমগ্র আফগানিস্তান – কখনো পূর্ব থেকে পশ্চিমে, কখনো বা উত্তর থেকে দক্ষিনে। রোদ-ঝড়-শীতকে উপেক্ষা করে- পাহাড় পাড়ি দিয়ে – কখনও ঠান্ডা বরফের উপর পায়ে হেটে, কখনো বা গাধার পিঠে চড়ে। এই দুর্গম যাত্রাপথে অনেক সময় তাঁর তরুন সাথীরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেও, কোন ক্লান্তিই আব্দুল্লাহ আযযামকে স্পর্শ করতো না।

আব্দুল্লাহ আযযাম জিহাদ করেছিলেন সম্ভাব্য সবগুলো উপায়ে। তিনি সাড়া দিয়েছিলেন আল্লাহ্‌র ডাকে -

"তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।" (সূরা আত তাওবাহ : ৪১)

নিজ পরিবারকেও তিনি এই একই আদর্শে গড়ে তুলেছিলেন। এমনকি তাঁর স্ত্রী পর্যন্ত ইয়াতীমদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং মানবসেবামূলক কাজের মাধ্যমে আফগান মুসলিমদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

তাঁর কাছে অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চাকরির প্রস্তাব আসলেও তিনি তার সবগুলোই ফিরিয়ে দিতেন। তিনি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন শাহাদাত অথবা শত্রুর হাতে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাঁর জিহাদ থামবে না। এবং তিনি বারবার এই কথা বলতেন যে শেষ পর্যন্ত তাঁর লক্ষ্য হল ফিলিস্তিনকে মুক্ত করা। তিনি সবসময় বলতেন-

“অন্য কোন জাতির পক্ষে কখনো মুসলিমদের পরাজিত করা সম্ভব না।আমরা মুসলিমরা কখনো আমাদের শত্রুদের কাছে পরাজিত হই না। বরং আমাদের পরাজয় ঘটে আমাদের নিজেদের হাতেই।”

ওসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানে এসে প্রথমেই আব্দুল্লাহ আযযামের কাছে গেলেন এবং তাঁরা দুজন একসাথে কাজ করা শুরু করলেন।

<u>প্রথমবারের মতো আফগানিস্তানে আসলেন ওসামা</u>

কৈশোরের শেষ দিকে এসে ওসামা শুনতে পেলেন রাশিয়ানরা আফগানিস্তান আক্রমণ করেছে এবং এর ফলশ্রুতিতে মৃত্যুবরণ করেছে দশ লক্ষাধিক আফগান। এই খবর জানার পর, অন্য আরো অনেক মুসলিম আরবের মতো তিনি আফগানদের জন্য আর্থিক সহায়তা জোগাড় করলেন – এবং তাঁদের সাহায্য করার লক্ষ্যে আফগানিস্তান চলে গেলেন।

ওসামা বিন লাদেন

আফগানিস্তানে তাঁর সাথে দেখা হলো আব্দুল্লাহ আযযামের। আব্দুল্লাহ আযযাম আরব মুজাহিদীনদের থাকা-খাওয়া এবং অন্যান্য সাহায্য-সহযোগিতা করতেন এবং ওসামা সাউদী আরব থেকে এর জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্যের যোগান দিতেন। আব্দুল্লাহ আযযামের উদ্দেশ্য ছিলো আফগানিস্তানের মুসলিমদের রক্ষা করা এবং সেখানে এমন একটি ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যার মাধ্যমে ইসলামের সত্যিকারের পুনঃজাগরণের শুরু হবে। মুসলিম বিশ্বের তাগুত শাসকেরা ১৯২৪ সালে উসমানী খিলাফার পতনের পর থেকেই বিভিন্ন কৌশলে প্রকৃত ইসলামিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকে বাধা দিয়ে আসছিলো – এমনকি সাউদী আরব, যেখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শারীয়াহ আইন পালন করা হতো, প্রকৃত পক্ষে ছিলো পশ্চিমা বিশ্বের অধীনস্ত একটি অনুগত দালাল রাষ্ট্র। পরবর্তীতে (২০০০ সাল এং তার পরে) আল কায়েদার মূল লক্ষ্য হল কোন ভুখন্ডে পরিপূর্ণ ইসলামিক রাষ্ট্র (খিলাফাহ) প্রতিষ্ঠার পূর্বে সব ধরনের পশ্চিমা আধিপত্যকে সেই ভূখণ্ড থেকে অপসারণ করা।

যে সময়ের কথা হচ্ছে সে সময়টাতে আমেরিকা এবং সাউদী আরব উভয়ই ছিলো জিহাদের পক্ষে। কারণ আমেরিকার উদ্দেশ্য ছিলো সুপারপাওয়ার হিসাবে তাঁদের একমাত্র প্রতিপক্ষ সোভিয়েত রাশিয়াকে যেকোন মূল্যে সরিয়ে দেওয়া। এজন্য যদি গরীব আফগানদের অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ দিতে হয়, তাতেও আমেরিকা রাজী ছিলো। এরই ফলশ্রুতিতে আফগানরা গেরিলা যুদ্ধ,বোমা তৈরি, শত্রুর বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যক্রম এবং সমরাস্ত্র ব্যাবহারে প্রশিক্ষণ লাভ করে। কিন্তু যা এই সময়ে আমেরিকার জানা ছিলো না তা হলো, এই আফগানদের মাধ্যমেই পরবর্তীতে তাঁদের নিজেদের পতনের সূচনা হবে।

রাশিয়ার পরাজয়

রাশিয়ানদের সাথে মুজাহিদীনের অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জালালুদ্দীন হাক্কানীদের মতো কম্যান্ডারদের কাছ থেকে আমরা এরকম অনেক কারামাতের ঘটনা শুনতে পেয়েছি যেখানে মুজাহিদীনের সম্বল ছিলো ব্রিটিশ আমলের তিনটি রাইফেল মাত্র [যা উনবিংশ শতাব্দীদে ব্রিটিশদের হারিয়ে আফগানরা গানীমাহ হিসেবে পেয়েছিলো] - এবং এই সামান্য ব্রিটিশ আমলের রাইফেলের একটি গুলিতেই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইচ্ছায় আলৌকিকভাবে রাশিয়ানদের ট্যাঙ্কগুলো বিস্ফোরিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যেত।

জালালুদ্দীন হাক্কানি

অনেক আফগান কমিউনিস্ট এসব কারামাত প্রত্যক্ষ করার পর দলবল নিয়ে অস্ত্র সহ মুজাহিদীনের কাছে আত্মসমর্পণ করে – এবং তাঁদের সব অস্ত্র মুজাহিদীনের হাতে চলে আসতো।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যেতো আফগান কমিউনিস্টরা তাঁদের রাশিয়ান প্রভুদের উপর অসন্তুষ্ট।

জালালুদ্দীন হাক্কানী এরকম আরেকটি ঘটনার বর্ণনা দেন যেখানে কম্যান্ডার হাক্কানীর দলের মুজাহিদ এবং আফগান কমিউনিস্টদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিলো। যুদ্ধচলাকালীন অবস্থায় হঠাৎ করেই একজন আফগান কমিউনিস্ট গুলি করে তাঁর নিজের কম্যান্ডারকে মেরে ফেললো, এবং তারপর সদলে কম্যান্ডার হাক্কানীর দলে যোগ দিলো। এবং এর মাধ্যমে মুজাহিদীনের প্রভাব বৃদ্ধি পেলো।

আফগানিস্তানে সজ্ঘটিত একটি কারামতের বর্ণনা -

যোদ্ধারা পাহাড়ের চূড়ার মাঝে ছড়িয়ে গিয়ে বিভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করল আর দিন বাড়ার সাথে সাথে দূর থেকে ট্যাংক বাহিনী এর গর্জন শোনা যেতে লাগল। যেই মুহূর্তে প্রথম ট্যাঙ্কটি পাহাড়ের মাঝে সঙ্কীর্ণ গিরিপথের মুখে প্রবেশ করল সে মুহুর্তে আল্লাহু আকবার রব তুলে মুজাহিদীনরা এই ট্যাংক বাহিনীর ওপর গুলিবর্ষণ করতে লাগলেন। যে ট্যাঙ্কগুলো তখনো গিরিপথে প্রবেশ করেনি তাদের ভারী মেশিনগান মুজাহিদীনদের উপর গুলি করা শুরু করল। মেশিনগানের গুলির আওয়াজ আর ছিটকে আসা টুকরো টুকরো পাথরের হট্টগোলের এর মাঝে হঠাৎ করে এক বিকট বিস্ফরণের শব্দে চারপাশ প্রকম্পিত হয়ে উঠল। সবাই অবাক হয়ে প্রথম ট্যাঙ্কটিকে বিস্ফোরিত হয়ে চারদিকে এর ছিন্নভিন্ন টুকরো গুলোকে ছড়িয়ে যেতে দেখল। আহমাদ গুল তার পুরনো রাইফেল উচিয়ে করে চিৎকার করে বলে উঠলেন "আল্লাহু আকবার। আল্লাহর পাঠানো বিজয় ও সাফল্য চলে এসেছে!"

এবার গিরিপথের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি জ্বালানী ট্রাককে এক রাউন্ড গুলি এসে আঘাত করল এবং তাতে আগুন ধরে তা কিছুক্ষনের মধ্যে বিস্ফোরিত হল। তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল আর এর বহন করে আনা গোলা-বারুদের কারণে চারপাশে বিরাট ধ্বংস সাধন হল। এরপর এমন একটি ঘটনা ঘটল যা আগে কেউ ভাবতে পারে নি - সৈন্যরা ট্যাঙ্ক গুলোকে গিরিপথের মুখে ও বাইরে রেখে সেখান থেকে লাফিয়ে বের হতে লাগল আর সেনাবাহিনীর চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল।

লড়াইয়ের শেষ দিকে, যুদ্ধবন্দী হিসেবে নিয়ে আসা ট্যাঙ্কের একজন কমান্ডার জানালো যে তারা ভেবেছিল মুজাহিদীন প্রথম ট্যাঙ্কটিকে একটি রকেট দিয়ে আঘাত করেছে। এতে সৈন্যরা যারা গিরিপথের দেয়ালের মাঝে ট্যাঙ্কের ভিতর আটকা পড়েছিল তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই তারা ট্যাঙ্কের উপরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং মুজাহিদীনদের সাথে গুলিবিনিময় করার জন্য পাথরের পিছে অবস্থান নেয়। এটা ছিল মুজাহিদীনদের জন্য একটা একটা করে শত্রুসৈন্য গুলি করে হত্যা করার এক সুবর্ণ সুযোগ, কারণ মুজাহিদীনরা ছিলেন প্রকৃতিগতভাবেই নির্ভুল লক্ষ্যভেদকারী।

শত্রুসৈন্যরা পরোপুরি ভাবে পরাজিত হল এবং মুজাহিদীনরা গানীমাহ হিসেবে অসংখ্য অটোমেটিক রাইফেল, মিডিয়াম মেশিন গান, পরিবহন গাড়ি ও ট্যাঙ্ক লাভ করলেন। কিন্তু এই সব কিছুর চাইতে গুরুত্বপুর্ণ ছিল যে তারা আরপিজি-৭ অ্যান্টি আর্মার গ্রেনেড লাভ করেছিলেন। এটা ওই অঞ্চলের যুদ্ধের ধারায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই লড়াইয়ের পরে মুজাহিদীনদের কাছে ট্যাঙ্ক আর আতঙ্কের কোন বিষয় হিসেবে থাকল না এবং তারা অস্ত্রের আক্রমণের বিপক্ষে আরও কৌশলী ও দক্ষ হয়ে উঠলেন।

যাবার পথে রাস্তায় প্রবীণ শেখ মাহমুদ লালা জালাল আল-দীন এর কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন, “জালাল আল-দীন, আমাকে বল সামনের ওই ট্যাঙ্কটার আসলে কি হয়েছিল?” চিন্তায় নিমগ্ন থাকা জালাল আল-দীন তাকে গভীরভাবে উত্তর দিলেন, “সুবহানআল্লাহ শেখ মাহমুদ, আমি কি আপনাকে বলিনি যে এগুলো হল জিহাদের রহমত। যারা আল্লাহর পথে থাকে আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন ও সাহায্য করেন।”

পরবর্তীতে এই দলটিই হাক্কানী নেটওয়ার্ক নামে পরিচিতি লাভ করে এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সবচেয়ে শক্তিশালী আফগান গেরিলা শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদের সময় জালালুদ্দীন হাক্কানী এবং আব্দুল্লাহ আযযামের মধ্যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সমগ্র নব্বইয়ের দশক এবং ২০০০ সাল পর্যন্ত হাক্কানী নেটওয়ার্ক, জালালুদ্দীন হাক্কানীর অধীনেই তাঁদের কার্যক্রম চালু রাখে। পরবর্তীতে বার্ধক্যের কারনে জালালুদ্দীন হাক্কানী – হাক্কানী নেটওয়ার্কের নিয়ন্ত্রন তাঁর ছেলে সিরাজুদ্দীন হাক্কানী, যিনি নিজে একজন মুজাহিদ এবং অভিজ্ঞ যোদ্ধা, তাঁর হাতে সমর্পণ করেন।

শুরুর দিকের তালিবান

রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে জিহাদে ওমরের (এই ওমরই পরবর্তীতে মোল্লা ওমর নামে পরিচিতি লাভ করে) মত অনেক যুবক অংশগ্রহণ করেছিল। এক লড়াইয়ে তার একটি চোখ গুলিতে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এটি তার মনোবলে একটুও চিড় ধরাতে পারেনি।

মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর

এইসব যুবক ধর্মভীরু পরিবার থেকে উঠে এসেছিল, তাদের শিখানো হয়েছিল কোন আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনী যদি মুসলিম ভূমির এক মুঠো পরিমাণ জমিও দখল করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

এইসব পুরুষ ছিল জন্মসূত্রে যোদ্ধা, দুঃসাহসী ও নির্ভীক। তাদের আরব ভাইদের মত তারাও ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবনাদর্শের কাছে মাথা নত করতে রাজী নয়, যে ইসলাম আফগানরা আজ থেকে প্রায় ১০০০ বছর আগে নিজেদের জীবনে গ্রহণ করেছে। আফগানিস্তানকে ডাকা হত 'সাম্রাজ্যবাদের কবরস্থান'। পরবর্তী ৩০ বছরে বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর সাথে আফগানিস্তানের যুদ্ধ যেন এই নামটিকে ক্রমাগত পরীক্ষা করতে থাকে।

আফগানিস্তানে রাশিয়া পরাজিত হলো

রাশিয়ানদের শক্তিশালী বিমানবাহিনী আফগানদের বিধ্বস্ত করে ফেলে। তাদের তীব্র গোলাবর্ষণে শহরের পর শহর ধ্বংস হয়ে যেত। রাশিয়ানরা মধ্য এশিয়ায় (আরবিঃ খোরাসান) সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এবং

তাদের প্রতিপক্ষ আমেরিকানদের সাথে পাল্লা দিয়ে বিশ্বে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আফগানদের পরাভূত করতে চেয়েছিল।

আফগানরা হিন্দুকুশ পর্বতের পাহাড়ি এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করতো, যা ছিল বিমান আক্রমণের বিপক্ষে এক প্রাকৃতিক আশ্রয়কেন্দ্র। কিন্তু তারা রাশিয়ানদের যুদ্ধবিমানের আক্রমণের বিরুদ্ধে কোন পাল্টা হামলা চালনোর ব্যাপারে অক্ষম ছিল।আমেরিকা আফগানদের স্টিংগার মিসাইল সরবরাহ করে, এটা ছিল আধুনিক ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য মারনাস্ত্র যা যুদ্ধবিমান গুলি করে নামাতে পারত। এটা পরবর্তীতে রাশিয়ানদের প্রধান শক্তি বিমানবাহিনীকে ধ্বংস করতে মূল ভূমিকা পালন করে।

আবদুল্লাহ আযযাম এবং ওসামা বিন লাদেন আরব ও আফগান যোদ্ধাদেরকে অবিরাম সাহায্য ও সেবা প্রদান করতে থাকেন। এমনকি তারা নিজেরাও অনেক লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন। বিশ্বপরাশক্তির বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের যুদ্ধে ‘সাহাবাদের সন্তান’ এই আরবদের অংশগ্রহণে আফগানরা অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করতেন।

এসকল লড়াইয়ের সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক কারামাতেরর প্রকাশ হয়, যেমন- পাখিরা মিসাইলের উপরে উড়তে থাকা অবস্থায় যোদ্ধাদেরকে মিসাইলের গতিপথ সম্পর্কে অবহিত করত, অন্যান্য সময়ে দেখা যেত যে কারো কারো শরীরের উপর দিয়ে ট্যাঙ্ক চলে গিয়েছে বা গায়ে গুলি লেগেছে কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে তারা কোন রকম আঘাত ছাড়াই বেঁচে গিয়েছেন। শহীদ যোদ্ধাদের শরীর থেকে স্বর্গীয় গন্ধ বের হত (আরব ও আফগানদের মতে এটা জান্নাতের সুগন্ধ, যেখানে শহীদদের আত্মা এখন বাস করছে)। অপরদিকে শত্রুপক্ষের মৃতদের শরীর থেকে পঁচা গন্ধ বের হত, সেগুলোকে অনেক সময় ফেলে যাওয়া হত এবং লাশগুলো কুকুর খেয়ে ফেলত। (আরও কারামাহ সম্পর্কে জানতে পড়ুন আবদুল্লাহ আযযামের বইঃ “আফগান জিহাদে আর- রহমানের নিদর্শন)।

সরবরাহ পথ বন্ধ করে দেয়ার সমরকৌশল

রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাওয়া আরব-আফগান ইসলামী প্রতিরোধ তাদের শক্তিশালী শত্রুদের পরাজিত করতে একটি নতুন কৌশল শিখে ফেলল। তারা জানত যে আফগানিস্থানে থাকা কমিউনিস্টরা অস্ত্র ও জ্বালানীর যোগানের জন্য পার্শ্ববর্তী মধ্য এশিয়ার দেশগুলো থেকে আফগানিস্তানে প্রবেশ করা সরবরাহ পথের উপর নির্ভর করত। তারা নিরবিচ্ছিন্নভাবে এই পথ লক্ষ্য করে হামলা করতো যাতে করে আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট বাহিনীর অস্ত্র ও জ্বালানীর মজুদ শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীতে এটাই কমিউনিস্টদের পরাজয়ের কারন হয়ে দাঁড়ায়। তাদের এই হামলাগুলোর পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে এও দেখা যেত যে অনেক আফগান তাদের কমিউনিস্ট কমান্ডারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত এবং তাদেরকে গুলি করে চলে আসত।

স্টিংগার মিসাইল ব্যবহার করে রাশিয়ার বিমান বাহিনীকে গুড়িয়ে দেয়া, কমিউনিস্টদের সরবরাহ পথে অতর্কিত আক্রমণ করা, আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট কমান্ডারদেরকে নিজ দলের লোক কর্তৃক হত্যা- এ সবকিছুই রুশ পরাশক্তির ক্ষমতা, মনোবল ও আর্থিক সামর্থ্য ধ্বংসের কারণ হয়ে দেখা দেয়। তারা বিশ্বের দরিদ্রতম এক জনগোষ্ঠির হাতে নিজেদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করে। এটাই রাশিয়ান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন (ইউ.এস.এস.আর) ও লাল বাহিনীর শেষের শুরু।

রাশিয়ান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এই যুদ্ধের পর আর কখনোই পরিপূর্ণ ভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়নি। কয়েক লক্ষ আফগান যোদ্ধা ও নিরপরাধ লোকের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আফগানরা ১০ বছর ধরে চলে আসা বহিঃশক্তির কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হল। ২০ বছর পর এই একই সমরকৌশল ব্যবহার করে আফগানরা আরও একবার সাম্রাজ্যবাদী দখলদার পশ্চিমা বাহিনীকে পরাজিত করে।

অধ্যায় ২ : ১৯৮৯ -২০০০, আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন

<u>আফগান গৃহযুদ্ধ এবং আল কায়েদার সূচনা</u>

রাশিয়ানরা আফগানিস্তান ছেড়ে যাবার সাথে সাথেই, চারিদিকে চরম নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ে। যেসব দল এবং গোত্রগুলো মাত্র কিছুদিন আগেও আক্রমণকারী রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক হয়ে যুদ্ধ করছিলো, তাঁরাই ক্ষমতার জন্য এখন একে অপরের সাথে লড়াই শুরু করে দিলো। দুর্নীতি আর অনিয়ম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।জায়গায় জায়গায় মুসাফির আর পথিকদের কাছ থেকে চাঁদা উঠানোর জন্য টোলবুথ গজিয়ে গেলো। প্রতি মাইল পর পর পথিক-মুসাফিরদের ভিন্ন ভিন্ন জুদ্ধবাজ নেতাদের চাঁদা দিতে হত।

কারো যদি অনুগত যোদ্ধা, অস্ত্র এবং ট্রাক না থাকতো তাহলে সে ছিলো অসহায়। নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দুআ করা ছাড়া তার অন্য কোন উপায় ছিল না। এই নৈরাজ্যময় পরিস্থিতির মাঝে ইসলামী দলগুলো তাঁদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখলেও তাঁরা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। আর ক্ষমতালোভী গোত্রীয় দলগুলো চারিদিকে গণহত্যা, ধর্ষণ আর লুটের রাজত্ব কায়েম করে দিলো।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ চলাকালীন অবস্থায় তাঁদের সংগঠনের ভিত্তি এবং আফগান এবং আরব মুজাহিদদের মধ্যে মতপার্থক্য কিভাবে সামলানো উচিত তা নিয়ে আব্দুল্লাহ আযযাম এবং ওসামা বিন লাদেনের মধ্যে বিস্তর

আলোচনা হয়। আব্দুল্লাহ আযযামের মত ছিলো যে আরবদের উচিত আফগানদের সাথে একীভূত হয়ে যাওয়া এবং দীর্ঘমেয়াদে আফগানিস্তানে ইসলামী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করা। এ বিষয়ে ওসামা কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করতেন। তাঁর মত ছিলো আরব মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি এলিট ফোর্স হিসেবে তৈরি করা, যাতে করে তাঁরা বিভিন্ন মুসলিম দেশে তাঁদের গেরিলা যুদ্ধের কৌশল এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামী বিপ্লবের আদর্শ ছড়িয়ে দিতে পারেন। ওসামার মতে বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহকে একীভূত করা ছাড়া দীর্ঘমেয়াদী ইসলামিক খিলাফাহ নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব না।

তাঁদের দুজনের এই মতপার্থক্যের কোন সুরাহা হবার আগেই ১৯৮৯ সালের এক শুক্রবার, জুমআর সালাতে শরীক হবার পথে, গাড়িতে লুকানো বোমার বিস্ফোরনে, স্বীয় দুই পুত্রসহ আব্দুল্লাহ আযযাম মৃত্যুবরণ করেন। (অনেকেই এই ঘটনার জন্য দায়ী করেন আফগান কমিউনিস্টদের যাদের তখনো পর্যন্ত আফগানিস্তানে কিছুটা উপস্থিতি ছিলো)

ওসামা এবং আফগান-আরবেরা

আফগান জিহাদ শেষ হবার পর অনেক আরব মুজাহিদ তাঁদের নিজ দেশে ফেরত যাবার চাইতে আফগানিস্তানে থেকে যাওয়াকেই শ্রেয় মনে করলেন। তাঁদের আশঙ্কা ছিলো পশ্চিমা বিশ্বের হাতের পুতুল, তাগুত আরব শাসকেরা তাঁরা দেশে ফেরা মাত্রই তাঁদের উপর নানা অত্যাচার-নিরযাতন শুরু করে দেবে। তাঁদের এই আশঙ্কা অমূলক ছিলো না। যেসব আরব মুজাহিদ ফেরত গেলেন তাঁরা নিজ দেশের অন্ধকার কারাগারে অবর্ণনীয় নির্যাতনের স্বীকার হন। তাগুত আরব শাসকগোষ্ঠী এই আফগান ফেরত মুজাহিদদের তাঁদের ক্ষমতার প্রতি মারাত্মক হুমকি মনে করতো – এবং এ কারনে তাঁদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাতো।

যেসব আরব মুজাহিদ আফগানিস্তানে রয়ে গেলেন তাঁরা বিয়ের করার মাধ্যমে আফগান এবং পাকিস্তানী জনগনের সাথে আত্মীয়তাঁর সম্পর্ক স্থাপন করলেন। এরকম ঘটনা বেশ বিরল, কারণ আফগানরা সাধারণত তাঁদের মেয়েদের নিজ জাতির বাইরে বিয়ে দিতে চাইতো না। সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় আরব মুজাহিদদের আফগানরা কতোটা শ্রদ্ধা করতো এবং আপন মনে করতো। পরবর্তীতে এই আরবরাই আফগান-আরব নামে পরিচিতি লাভ করেন।

ঠিক একইসময় আফগানিস্তানে অবস্থান করছিলেন আরেক দল আরব। তাঁরা পরিচিত ছিলেন ‘মিশরীয় আরব’ নামে, এবং তাঁদের পরিকল্পনা ছিলো কিছুটা ভিন্ন। সাইদ কুতুবের শিক্ষায় অনুপ্রানিত এসব আরবদের উদ্দেশ্য ছিল, বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামের শত্রু এবং পশ্চিমা বিশ্বের হাতের পুতুল তাগুত আরব শাসকদের উৎখাত করা। এদের মধ্যে ছিলেন আইমান আল যাওয়াহিরী (আল কায়েদার বর্তমান নেতা), সাইফ আল আদলী এবং সামরিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আরো কিছু মিশরীয় আরব।

এই যোদ্ধাদের চিন্তা করছিলেন কিভাবে তাগুত শাসকদের উৎখাত করে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে আফগানিস্তানকে একটি ঘাঁটি হিসেবে ব্যাবহার করা যায়। আফগান জিহাদের আগে, আনোয়ার সাদাতের শাসনামলে এই তাগুত সরকারগুলো মিশরের কারাগারগুলো ব্যাবহার করে এই যোদ্ধাদের উপর নিষ্ঠুর, পাশবিক নির্যাতন চালাচ্ছিলো। এই আনোয়ার সাদাত সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছিলো এবং ইসরাইলের সাথে চরম অপমানজনক এক শান্তিচুক্তি সই করেছিলো।

আফগান জিহাদের আগে কারাগারে বন্দী নির্যাতিত এসব যোদ্ধা আফগানিস্তানের মাটিতে ছিলেন মুক্ত। এই মাটি তাঁদের এনে দিয়েছিলো ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতি নিয়ে পরিকল্পনা করার এক সুবর্ণ সুযোগ।

১৯৯০-১৯৯৬, সৌদি আরবে ওসামার প্রত্যাবর্তন

অভিজাত এবং সম্মানীত পরিবারের সন্তান হবার সুবাদে আফগানিস্তান থেকে ফিরে ওসামা খুব সহজেই তাঁর পুরনো জীবনে ফিরে যেতে পারলেন। কিন্তু আফগানিস্তানের জিহাদের সাফল্য তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো যে মুসলিমরা যদি সত্যিকারভাবে চেষ্টা করে তাহলে বহিঃশক্তির প্রভাব মুক্ত করে উম্মাহর অতীত গৌরবের দিনগুলিকে আবারও ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তাঁর ইচ্ছা ছিলো উম্মাহর এই পরিবর্তনের সূচনা করা, তিনি নিজের অতীতের আরামের দিনগুলোতে ফেরত যেতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

এসময়ে ইরাকে বসে সাদ্দাম হুসেইন তাঁর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো আক্রমণ করার হুমকি দিচ্ছিলো। একজন কট্টর আরব জাতীয়তাবাদী হওয়া সত্ত্বেও, অন্য অনেক আরব শাসকদের মতো সাদ্দাম ইরাকের জনগণকে ইসলামী শিক্ষা গ্রহন করতে বাধা দেয়নি। (পরবর্তীতে এটি আমেরিকার ইরাক অভিযানের ব্যর্থতার প্রধান একটি কারণ হিসেবে প্রমানিত হয়)। এসময় সাদ্দাম হুমকি দিচ্ছিলো কুয়েত আক্রমণের – এবং ওসামা জানতেন যে তারপর সাদ্দামের টার্গেট হবে সাউদী আরব।

ওসামা সাউদী রাজা ফাহাদকে পরামর্শ দিলেন সাদ্দামের এই হুমকি আগে থেকেই মোকাবেলা করার। তিনি আফগান জিহাদের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক লক্ষ মুজাহিদ নিয়ে সাদ্দামের আক্রমণ মোকাবেলা করার প্রস্তাব দিলেন। সেইসময় পর্যন্ত ওসামা সৌদির রাজাকে সম্মান করতেন এবং তাঁকে ওয়ালী আল আমর (রক্ষক এবং নেতা – যার আনুগত্য করা উচিত) বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু সৌদি রাজা ওসামার এই প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিলেন এবং সৌদি আরবকে রক্ষা করার জন্য আমেরিকার সৈন্যবাহিনীকে সৌদি আরবে প্রবেশের অনুমতি দিলেন! এই ঘটনা একই সাথে ওসামাকে স্তম্ভিত এবং ক্রুদ্ধ করে তুললো।

বারবার ওসামা শুধু চিন্তা করতে থাকলেন দুই পবিত্র মসজিদের (মক্কা ও মদীনাতে) ভূমিতে কি করে ফাহাদ কাফির সৈন্যদলকে ঢুকতে দিলো?

“মুশরিকীনদের আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দাও” – রাসূল [সাঃ] এর একটি অতি প্রসিদ্ধ হাদীস, যার উপর ভিত্তি করে আমীরুল মুমিনীন ঊমার ফারুক (রাঃ) ইয়াহুদী এবং খ্রিস্টানদেরকেও আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করেন।

সুতরাং মুসলিম পুরুষরা জীবিত থাকা অবস্থায় কিভাবে রাসূল[সাঃ] –এর জন্মভূমি, মুসলিম উম্মাহর সবচাইতে পবিত্র ভূমিকে রক্ষার জন্য কিভাবে কাফির আমেরিকান সৈন্যদের সহায়তা নেওয়া সম্ভব! আবার এই আমেরিকান সৈন্যদের মধ্যে অনেক আবার মেয়ে! অথচ মুসলিম পুরুষরা এখনো জীবিত! কোন ভাবেই ওসামা এই অপমান এবং সীমালঙ্ঘনকে মেনে নিতে পারছিলেন না।

এসব কারনে সৌদি রাজার প্রতি ওসামার মনে তীব্র বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়। রাসূল[সাঃ] – এর জন্মভূমির উপর কাফির আমেরিকার দখলদারিত্ব মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তিনি ঠিক করলেন আমেরিকার দখলদারিত্ব থেকে ইসলামের পবিত্র ভূমি রক্ষার জন্য যদি আর কেউ কোন কিছু না করে, তাহলে তিনিই চেষ্টা করবেন।

সৌদি আরব থেকে সুদানে

নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে সুদানের শাসক ছিলেন হাসান আল তুরাবী। সুদানের কাছে আশ্রয় চাওয়া যেকোন মুসলিমকে তাঁর সরকার এই সময় নাগরিকত্ব প্রদান করছিলো। আফগানিস্তানের তীব্র গৃহযুদ্ধ এড়াতে এসময় অনেক আফগানী-আরবই সুদানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এসময় ওসামাও সাউদী ছেড়ে সুদানের দিকে পা বাড়ালেন এবং সুদানে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করা শুরু করলেন। এসময়টাতে তিনি মূলত তাঁর ব্যবসা, খামার ও চাষবাস, মসজিদে সালাত আদায় করা এবং সাধারন ইসলামী জীবনযাপনে মনোনিবেশ করেন।

পিতার মতো ওসামাও ছিলেন একজন নির্মাতা। এসময় তিনি সুদানের মুসলিমদের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণসহ নানা নির্মাণ কাজ শুরু করেন। এসব খাতে তিনি বেশ কয়েক মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেন।

কিন্তু এতো কিছু সত্ত্বেও তিনি পবিত্র ভূমির উপর আমেরিকার দখলদারিত্বের কথা বিস্মৃত হন নি। শত ব্যস্ততাঁর মাঝেও তিনি সারাক্ষণ চিন্তা করছিলেন কিভাবে আমেরিকাকে পরাজিত করা যায়। অচিরেই এক সমাধান তাঁর সামনে উপস্থিত হল।

যুদ্ধের শুরুঃ ব্ল্যাক হক ভূপাতিত!

সোমালিয়াতে আমেরিকান ও সোমালিদের মধ্যে একটা ছোটখাটো যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। ওসামা এবং তাঁর অনুগত মুজাহিদীন –যারা এসময় আনফিসিয়ালী আল কায়েদা আল জিহাদ (বিশ্বব্যাপী জিহাদের ঘাঁটি) নামে পরিচিত ছিলো – এই যুদ্ধে সোমালিদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

এই যুদ্ধে আমেরিকার মূল কৌশল ছিলো তাঁদের **Black Hawk** হেলিকপ্টারগুলো দিয়ে আক্রমণ করা।

একরকম আকস্মিকভাবেই এসময় আল কায়েদার মুজাহিদরা এক নতুন যুদ্ধকৌশল আবিষ্কার করেন। তাঁরা দেখতে পেলেন **RPG** দিয়ে রকেট প্রপেলড গ্রেনেড ছুড়ে যদি হেলিকপ্টারের লেজে লাগানো যায়, তাহলে সেই হেলিকপ্টারে খেলা শেষ! ভূপাতিত হওয়া ছাড়া তাঁর আর কোন উপায় নেই।

বেশ জটিল ও কষ্টসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও আল কায়েদা তাঁদের এই কৌশলের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করে এবং ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার ভূপাতিত করতে সক্ষম হন। ফলে লেজ গুটিয়ে হেলিকপ্টার নিয়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমেরিকানদের আর কোন উপায় ছিলো না। পরবর্তীতে এ এক ইউনিক আল কায়েদা রণকৌশল হিসেবে পরিচিত লাভ করে। হলিউডের বিখ্যাত ছবি **Black Hawk Down** এই ঘটনার উপর ভিত্তি করেই বানানো হয়।

এই ঘটনার মাধ্যমে ওসামার কাছে পরিস্কার হয়ে গেলো যে আমেরিকানরা কাগুজে বাঘ ছাড়া আর কিছুই না। বাইরে থেকে দেখে অনেক ভয়ঙ্কর ও ভীতিকর মনে হলেও, ভেতরে তাঁরা দুর্বল, ভীরু এবং কাপুরুষ। এ ঘটনা তাঁর আত্মবিশ্বাসকে কয়েক গুনে বাড়িয়ে দেয়, এবং পবিত্র মুসলিম ভূমি দখলদারিত্ব উৎখাতে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে জিহাদে তিনি আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠেন।

এসময় তিনি পারমাণবিক অস্ত্র কেনারও চেস্টা চালান কারণ আক্রমণ প্রতিরোধক অস্ত্র **–Deterrent Weapon –** হিসেবে পারমাণবিক অস্ত্রই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। বেশ কয়েক বার ঠকবার পর, এবং কয়েক মিলিয়ন ডলার খরচ করার পরও তিনি তাঁর এই প্রচেস্টা অব্যহত রাখেন। ফলে অস্ত্র বাণিজ্যে তাঁর অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে এই অভিজ্ঞতা পুজি করে আল কায়েদার উপর ফেলা আমেরিকার অবিস্ফোরিত বোমা তিনি লক্ষ লক্ষ ডলারে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের (যেমন-চীন) কাছে বিক্রি করেন।

দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য

ওসামার পরবর্তী দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ছিলো আমেরিকার স্পর্শকাতর জায়গাগুলোকে টার্গেট বানানো এবং সেসব জায়গায় আঘাত হানা। প্রথমে তিনি কেনিয়াতে আমেরিকান দূতাবাসে আঘাত করলেন। তারপর **৯/১১**-এর ঠিক

একবছর আগে তিনি ইয়েমেন সমুদ্রে অবস্থিত মার্কিন জাহাজ ইউ.এস.এস কোলে হামলা করেন। আল কায়েদা যোদ্ধারা বিস্ফোরক বোঝাই একটি স্পীডবোট নিয়ে জাহাজের মাঝ বরাবর আঘাত হেনে বিস্ফোরণ ঘটান। এর ফলে অনেক মার্কিন সৈন্য নিহত হয়।

এসব আক্রমণের মাধ্যমে ওসামা চেষ্টা করছিলেন আমেরিকাকে প্রলুব্ধ করার, যাতে করে তাঁর ফাঁদে পা দিয়ে আমেরিকা আরেকটি মুসলিম দেশ আক্রমণ করে বসে। ওসামা নিশ্চিত ছিলেন যে আমেরিকা যদি আরেকটি মুসলিম ভূখণ্ড আক্রমণ করে তাহলে অবশ্যই আরেকটি জিহাদ এবং নবজাগরণ শুরু হবে (যেমনটা আফগানিস্তানে হয়েছিলো)।

সোমালিয়া,কেনিয়া, ইয়েমেনে তিনি বারবার আমেরিকাকে যুদ্ধে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমেরিকানরা কোন প্রতিউত্তর দিলো না। আমেরিকানরা জানতো যে ওসামা বিন লাদেন নামে একজন ব্যক্তি তাঁদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন – কিন্তু কেন তাঁরা কোন পাল্টা আক্রমণ করছিলো না?

সৌদি আরব কতৃক ওসামার নাগরিকত্ব বাতিল

সাউদী আরব অবগত ছিলো যে তাদেরই একজন নাগরিক তাঁদের প্রভু আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছে। তাই তাঁরা ওসামার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিকে তাঁর কাছে পাঠালো যাতে করে তাঁরা বুঝিয়ে-শুনিয়ে ওসামাকে থামায়।

তাঁদের সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে ওসামা এমনকিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন যা বলা হয়ে গেলে হয়তো আজকের পৃথিবীর ইতিহাস অন্যরকম হতো, কিন্তু আল কায়েদার কিছু মিশরীয় সদস্য এসময় তাঁর কানে কানে এমন কিছু বলেন যা আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের সিদ্ধান্তে ওসামাকে অটল ও অবিচল রাখে। একারনে সৌদি সরকারে অনেক ব্যক্তি জিহাদের প্রতি ওসামার এই দৃঢ় অঙ্গীকারের জন্য আল কায়েদার মিশরীয় সদস্যদের দায়ী করে।

শেষ পর্যন্ত সাউদী আরব ওসামার নাগরিকত্ব বাতিল করে, এবং তাঁর কাছ থেকে তাঁর পাসপোর্ট কেড়ে নেয়। এর ফলে সাউদী রাজপরিবার ও শাসকগোষ্ঠীর প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা আরো বৃদ্ধি পেলো। এই রাজপরিবার ইতিমধ্যেই আমেরিকানদের মুসলিমদের সবচাইতে পবিত্র ভূমিকে সামরিক ও অর্থনৈতিক ভাবে দখল করার সুযোগ করে দিয়েছিলো। এবার তাঁরা সুস্পষ্টভাবে নিজেদের আমেরিকার দালাল হিসেবে প্রমান করলো।

সুদানে থাকা অবস্থায় বেশ কয়েকবার ওসামাকে হত্যার জন্য আততায়ীরা চেষ্টা চালায়। তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে তিনি যেই মসজিদে সালাত আদায় করতেন সেখানেও একদিন গুলি চালানো হয়, কিন্তু অসুস্থ থাকার কারনে ওইদিনই তিনি মসজিদে অনুপস্থিত ছিলেন।

একে কেউ বলবে ভাগ্য, কেউ বলবে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পরিকল্পনা।

সুদান ত্যাগ

এরকম অবস্থায় হঠাৎ একদিন সুদানের সরকার ওসামাকে জানালো যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁকে সুদান ত্যাগ করতে হবে। (সম্ভবত ওসামাকে বহিষ্কারের জন্য আমেরিকার চাপ ও হুমকির মুখে নতি স্বীকার করে সুদান এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো)।

সুদানে বিনিয়োগ করা তাঁর লক্ষ মিলিয়ন ডলার পানিতে গেল। তাঁর বিষয়-সম্পত্তি তাঁকে অতি দ্রুত, অতি কম দামে বিক্রি করে দিতে হল। সুদানীসদের দেওয়া একটি নিম্ন শ্রেনীর বিমানে করে তিনি সুদান ত্যাগ করলেন। প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় তিনি আফগানিস্তানে পুনরায় হিজরত করলেন।চারপাশের মানুষগুলো তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো। এসময়টাতে তিনি অত্যন্ত হতাশ বোধ করছিলেন।

আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্তন

আশি ও নব্বইয়ের দশকে ইউনুস খালিস ছিলেন প্রথম সারির আফগান মুজাহিদ কম্যান্ডারদের মধ্যে একজন। তিনি সাদরে ওসামাকে আফগানিস্তানে বরণ করে নিলেন এবং তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।আফগানদের মধ্যে ওসামা ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত। আফগান জিহাদে ওসামার ভূমিকা তাঁরা ভুলে যাননি।

নব্ববইয়ের দশকের পুরোটা জুড়েই আফগানিস্তানে চলে তীব্র গৃহযুদ্ধও। কিন্তু এরই মাঝে উত্থান ঘটে নতুন এক দলের, যাদের নাম তালিবান (তালিব-শব্দের অর্থ ছাত্র, তালিবান এর বহুবচন)।

শুরুর দিকে তালিবান সম্পর্কে বিশেষ কিছু না জানলেও, যখন তিনি জানতে পারলেন যে তালিবানের আন্দোলন একটি ইসলামী আন্দোলন, তখন ওসামা তালিবানের সাথে আল কায়েদার সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন।

তালিবান

তালিবান নেতা মোল্লা মোহাম্মাদ উমর - রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদে ডান চোখে গুলিবিদ্ধ হন।

তালিবানের নেতা মোল্লা মোহাম্মাদ উমর তাঁর নিজ মুখে তালিবান আন্দোলনের সূচনার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি এবং মাদ্রাসার কিছু ছাত্র চলমান আফগান গৃহযুদ্ধ এবং এর ভয়াবহতা নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। প্রতিদিনই তাঁরা শুনতে পেতেন, নারীদের অপহরণ করার হচ্ছে, ধর্ষণ করা হচ্ছে, খুন করা হচ্ছে, মানুষের ধন-সম্পদ লুট করা হচ্ছে। এসব কিছু তাঁদের ধৈর্যের সীমার বাইরে চলে গিয়েছিলো।

আফগানিস্তানের পাহাড়ে তালিবান মুজাহিদরা

তিনি এবং ছাত্ররা (তালিবান) চারপাশের অরাজকতা বন্ধ করা এবং কুরআনে বর্ণিত 'সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজ বাধা দেবার গুরু দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে, তাঁদের কিতাব সমূহ বন্ধ করে হাতে অস্ত্র তুলে নিলেন। জন্মভুমি কান্দাহার থেকে এই মহান আন্দোলনের শুরু হলো। একটা ট্রাক, একটা ধারকরা মোটরবাইক আর আল্লাহ্‌র সাহায্যের ভরসা –এই তিনটি জিনিস নিয়ে তালিবান তাঁদের অভিযানে বেড়িয়ে পড়লেন। সময়টা ছিল ১৯৯৪।

তালিবান নানা অঞ্চল ঘুরে ঘুরে যুদ্ধবাজ নেতা (Warlords) এবং ডাকাত এবং অন্যান্য অপরাধীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা শুরু করে দিলো। আস্তে আস্তে জনজীবনে স্থিতিশীলতা ফিরে আসতে শুরু করলো। তাঁদের শক্তি-প্রভাব বাড়ার সাথে সাথে তাঁদের প্রতি সাধারণ জনগণের সমর্থনও বৃদ্ধি পেতে থাকলো।এভাবে তালিবানরা কান্দাহারের বাইরে অন্যান্য প্রদেশগুলোতেও অভিযান চালানো শুরু করলো।

২০০১ সালের মধ্যে সমগ্র আফগানিস্তানে তাঁদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়লো। আমেরিকার নেতৃত্বে তালিবানের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ শুরু হয়, তখন তাঁরা আফগানিস্তানের দুর্গম পাহাড়গুলোতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

আমেরিকার ঔদ্ধত্য

আফগানিস্তানে রাশিয়ার পরাজয়ের পর আমেরিকা নিজেদের সর্বেসর্বা ভাবতে শুরু করে। তাঁরা তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী উদ্ধত দৃষ্টি দিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে দেখতে শুরু করে। রাশিয়ার পতনের পর একমাত্র সুপারপাওয়ার হিসবে তাঁরা নিজেদের অজেয় মনে করা শুরু করলো।

রাশিয়ানরা চলে যাবার পর তাঁরা আফগানিস্তানকে একরকম ভুলেই গেলো। এমনকি তাঁরা সেখানে দূতাবাস স্থাপনও জরুরী মনে করলো না। তাঁদের যদি কোন দূতাবাস থাকতো তাহলে তাঁর মাধ্যমে, গোয়েন্দা দিয়ে তাঁরা আফগানিস্তানের ঘটনাবলীর উপর নজরদারী চালাতো পারতো। কিন্তু অতোটুকুও না করার ফল হল এই যে, রাশিয়ার পরাজয় পরবর্তী পাঁচ বছর আফগানিস্তানের বাস্তব অবস্থা নিয়ে আমেরিকা ছিলো সম্পূর্ণ অন্ধকারে। গর্ব এবং ঔদ্ধত্য আমেরিকাকে অন্ধ করে দিয়েছিলো – এবং পরবর্তীতে তাঁদের এইজন্য চড়া মাশুল দিতে হয়। আবারো কেউ একে বলবেন ভাগ্য, কেউ বলবেন আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা।

পশতুন (আফগানিস্তানের জাতীয় ভাষা) ভাষায় মুল্লাহ শব্দের অর্থ –ইসলামী শিক্ষার ছাত্র, এবং মৌলভী অর্থ – আলেম।

শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা এবং গৃহযুদ্ধ থামানোর উদ্দেশ্যে মোল্লা উমার তাঁর পড়াশোনা ছেড়ে চলে আসেন। তিনটি অত্যন্ত কড়া ভাবে শারীয়াহ আইন পালন করা শুরুর করেন। কারণ এটাই ছিল আফগান যুদ্ধবাজ নেতাদের নিয়ন্ত্রনে আনার একমাত্র উপায়।

তালিবানের মূলনীতি ছিলো – 'চোখের বদলে চোখ, জীবনের বদলে জীবন'।

সুতরাং অন্যকে আঘাত করার অর্থ নিজের উপর সমপরিমান আঘাত টেনে আনা। এই নীতি অত্যন্ত সফল প্রমাণিত হয়। তালিবান শাসনের অধীনে আফগান জীবনে অভূতপূর্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতা দেখা দেয়।

২০০০ সালের মধ্যে আহমাদ শাহ মাসউদের নিয়ন্ত্রণাধীন কিছু অঞ্চল ছাড়া পুরো আফগানিস্তান তালিবানের নিয়ন্ত্রনে চলে আসে। আহমাদ শাহ মাসউদের বাহিনী পরবর্তীতে উত্তরাঞ্চলীয় জোট **(Northern Alliance)** নামে পরিচিতি লাভ করে।

আহমাদ শাহ ছিলো তাজিক (পশতুন নয় এমন আফগান), এবং একজন শিয়া। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সে একজন কম্যান্ডারের ভূমিকা পালন করে – এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ আযযাম তাঁর প্রশংসাও করেছিলেন। কিন্তু রাশিয়া পরাজিত হবার পর আহমাদ শাহর তীব্র সুন্নী বিদ্বেষী, প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায়।

সমগ্র আফগানিস্তান তালিবানে নিয়ন্ত্রনে চলে আসার পথে এই আহমাদ শাহই ছিলো একমাত্র বাধা। কিন্তু ওসামা এবং আল কায়েদা আফগানিস্তানে আসার পর, তালিবানের জন্য এই বাধাটুকুও আর থাকলো না।

তালিবানের শত্রু তাজিক উত্তরাঞ্চলীয় জোট **(Northern Aliiance)** –এর নেতা শিয়া আহমাদ শাহ্ মাসউদ

আলকায়েদা এবং তালিবান ঐক্য

ওসামা এবং তাঁর যোদ্ধারা আদর্শ ও সংকল্পে পরিচিত ছিলেন আল কায়েদা আল জিহাদ [বিশ্বব্যপী জিহাদের ঘাঁটি] নামে। আর মোল্লা উমার ও তাঁর যোদ্ধাদের পরিচয় ছিলো – তালিবান। এই দুটি দলের একই ইসলামী আদর্শ হবার কারনে তাঁদের ঐক্যের ফলে উভয় দলই বেশ কিছু সুবিধা লাভ করে।

দুটো দলেরই উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী রাস্ত্রব্যবস্থা কায়েম করা। তবে সেই সময়ে তালিবানের লক্ষ্য ছিলো আফগানিস্তান কেন্দ্রিক আর আল কায়েদার লক্ষ্য ছিল বৈশ্বিক।

যেহেতু আফগানিস্তানে একটি ইসলামী রাস্ট্র প্রতিষ্ঠায় তালিবানের পথে একমাত্র বাধা ছিলো আহমাদ শাহ্ মাসউদ, তাই ওসামা অঙ্গীকার করেন এই ব্যাপারে তালিবানকে সাহায্য করার। এমনকি তিনি আমীরুল মুমিনীন [বিশ্বাসীদের নেতা] হিসেবে মোল্লা উমারের হাতে আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত)দেন।

তালিবানের ও মাসউদের বাহিনীর (উত্তরাঞ্চলীয় জোট) মধ্যে অনেক গুলো যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। মাসউদের বাহিনীর যোদ্ধারা প্রায়ই বলতো যে তালিবানের সাথে যুদ্ধ ছিল সমানে সমানে। কিন্তু আল কায়েদা যোদ্ধারা ছিলো অত্যন্ত বিপদজনক, এবং তাঁদের সাথে যুদ্ধ করা ছিলো সব চাইতে কঠিন।

এটার কারণ হল – আফগানদের মধ্যে বয়স্ক যোদ্ধাদের অনেকেই আনন্দময় দীর্ঘজীবন কামনা করতেন, এবং নিজ নিজ পরিবারের উপস্থিতিতে স্বাভাবিক মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করতেন।

কিন্তু বেশীর ভাগ আরব মুজাহিদ ছিলেন শাহাদাতকামী এবং এজন্য তাঁরা যুদ্ধের ময়দানে চরম ঝুঁকিপূর্ণ এবং বেপরোয়া সব কাজ করতেন* - যা তাঁদের অত্যন্ত বিপদজনক মরণপণ যোদ্ধা বানিয়ে তুলেছিল।

*উদাহরণস্বরূপ –রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদের সময় আল কায়েদার এই মুজাহিদরা উজ্জ্বল তাবু খাটাতেন, যাতে করে শত্রু তাঁদের দেখতে পেয়ে তাঁদের উপর বোমা ফেলে। তাঁরা ছিলেন এতোটাই শাহাদাতকামী।

মাসুদের সমাপ্তি

নব্বই এর দশকের শেষদিকে তালিবানদের প্রভাব ছিল অনেক বেশি এবং তা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। যুক্তরাষ্ট্র (সি.আই.এ- সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি) তালিবানদের এই ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে প্রতিহত করার জন্য মাসুদ ও তার বাহিনীকে (উত্তরাঞ্চলীয় জোট) আর্থিক সাহায্য প্রদান করে। এই দলের মূল ভূমিকা ছিল তালিবানদের ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নীতির বিরোধিতা করা এবং রাজধানীতে মাসুদের নিজস্ব সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা কিনা যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণে থাকা অবস্থায় একটি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল আফগানিস্থান রাষ্ট্র তৈরী করবে।

আহমেদ শাহ মাসউদ – তাজিক উত্তরাঞ্চলীয় জোটের শিয়া কম্যান্ডার এবং সে তালিবানের একজন শত্রু।

মাসুদ ছিল একজন ধূর্ত শত্রু। সে প্রায়শই যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে টাকা নিত (মাঝেমাঝে অর্ধ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত) এরপর নানা অজুহাত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝাত কেন এই অর্থ দিয়ে সে বলার মত কিছুই অর্জন করতে পারেনি। আফগানরা বিচক্ষণ ও কুশলীমানুষ হিসেবে পরিচিত যারা কখনোই বহিরাগত কর্তৃত্বের কাছে নতি স্বীকার করে না। যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যত পতনের পিছে এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। (এটা একটা জানা কথা যে কারজাই সরকারের অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীই তাদের ন্যাটো ও যুক্তরাষ্ট্রীয় উপদেষ্টাদের প্রতি অবাধ্য ও

বিদ্রোহী আচরণ প্রকাশ করে। অনেক ক্ষেত্রে তারা জেদের বশে ও নিজেদের স্বাধীনতা প্রমাণ করার জন্য নিজেদের জন্য লাভজনক কাজ করতেও অস্বীকৃতি জানায়।)

সুতরাং বলা চলে যে তালিবানরা এমন এক শত্রুর মোকাবিলা করছিল যারা ক্রমাগত যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অর্থের যোগান পাচ্ছিল। এত আর্থিক সহায়তা মাসুদকে আরও বেশি লোক পেতে সক্ষম করে তোলে যা তালিবানদের একটি স্থিতিশীল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এসময়ে ওসামা তালিবানদের কাছে এ সমস্যার একটি সম্ভাব্য সমাধানের প্রস্তাব তোলেন।

মাসুদ ছিল একজন সুবক্তা, সে পশ্চিমা মিডিয়ার কাছে নিজেকে আফগানিস্থানের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য কাজ করতে থাকা একজন যোদ্ধা হিসেবে তুলে ধরে। পশ্চিমাদের সব অর্থের যোগান তার কাছে আসতে থাকে আর উত্তরাঞ্চলীয় জোট এর নেতৃত্ব দিতে থাকে। তালিবানদের হাতে তাকে থামানোর মত কোন অস্ত্রই ছিল না।

ওসামা একটি সম্ভাব্য সমাধান বের করলেন। ইসলামী মাগরিব (মরক্কো, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া) থেকে আগত কিছু আরব পুরুষের সাথে ওসামার পরিচয় ছিল। ঔপনিবেশিক আমলে এসব দেশ ছিল ফরাসী সাম্রাজ্যের অংশ। ওসামা খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে এমন কিছু লোককে বাছাই করলেন যারা ছিল সম্ভবত ফর্সা গায়ের রঙের অধিকারী এবং তারা ফরাসী ভাষায় কথা বলত। তারা সাংবাদিক সেজে মাসুদের বিশ্বাস অর্জন করতে সচেষ্ট হয়।

মাসুদের লোকদের সাথে বেশ কিছুদিন থাকার পর তারা মাসুদের বিশ্বস্ততা লাভ করে।কোন অস্ত্র বহন করা যাবে না এই শর্তে তারা সরাসরি মাসুদের সাক্ষাৎকার নেয়ার অনুমতি লাভ করে। সাংবাদিক, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের কোন অস্ত্র নেয়ার কথা না, কিন্তু এই লোকেরা যে ক্যামেরা দিয়ে মাসুদের সাক্ষাৎকার ধারণ করা হবে সেখানে গোপন বোমা তৈরি রাখে। যে মুহূর্তে সাক্ষাৎকার নেয়া শুরু হল এবং ক্যামেরাটি চালু করা হল সেই মুহূর্তেই বোমাটি বিস্ফোরিত হয়। মাসুদসহ সেখানে উপস্থিত তার দলের সব লোক এবং এই শাহাদাতী হামলায় **[martyrdom operation]** এ সাংবাদিক সেজে আসা আরব মুজাহিদ- সবাই মৃত্যুবরণ করে। পুরো পশ্চিমা মিডিয়ায় এই ঘটনায় সোরগোল পড়ে গেল। কিন্তু বিপুল সংখ্যক প্রাণহানী ছাড়াই ওসামার লোকেরা তালিবানদের বিজয়ী করে তোলায় মোল্লা ওমর ওসামা বিন লাদেন ও আল-কায়েদার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হলেন।

মাসুদের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে তার মত আর কোন প্রভাবশালী নেতা না পাওয়ার কারণে উত্তরাঞ্চলীয় জোট পুরোপুরি ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যেতে শুরু করল।

ইসলামিক আমিরাত আফগানিস্থান (২০০১)

২০০১ সালের শেষার্ধে আফগানিস্থানে তালিবানই ছিল একমাত্র শক্তিশালী দল এবং তারা ইসলামী শরিয়াহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে থাকে। এসময় আফগানিস্থান ছিল অনেক বেশি স্থিতিশীল।

ইসলামিক আমিরাত অফ আফগানিস্তানের ওয়েবসাইট

মোল্লা যায়ীফের বর্ণিত দুইটি ঘটনা থেকে আমেরিকার আফগানিস্থান আক্রমণের পূর্বে সেখানকার তালিবান শাসনের সাম্য ও ন্যায়বিচারের চিত্র সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়ঃ

মৌলভী পাসানাই সাহেব তার নিরপেক্ষ বিচার ও শাসন এর জন্য খ্যাত ছিলেন। তার সামনে যাকেই আনা হত, যদি তারা আত্মীয় বা বন্ধুও হত, তিনি ন্যায়বিচার করতেন। তিনি শরীয়াহ আইনে নির্দেশিত আল্লাহ্র আদেশ মেনে চলতেন। তার চালিত অনেকগুলো মামলার কথা আমার মনে আছে, কিন্তু এর মধ্যে দুইটি আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে;

ঘটনা#১

পাশমোল এর কাছে শুকুর হিল নামে এক জায়গা আছে যেখানে বেশিরভাগ হত্যাকান্ডের শাস্তি দেয়া হত। যখন একজন অপরাধীকে কে শাস্তি দেয়ার জন্য পাহাড়ে ওঠানো হত তখন আমরা জায়গাটাকে নিরাপদ করতাম।

তোয়ান, যে কুরবান নামেও পরিচিত ছিল, সে আমার ছেলেবেলার গ্রাম চারশাখার একজন লোককে চাকু দিয়ে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করেছে। তাকে শুকুর হিলে নিয়ে আসা হয়েছিল।

অনেক মুসলিম যোদ্ধা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন এবং মৃতের পিতা ও পরিবার তার জন্য অপেক্ষা করছিল। যখন তোয়ানকে খালি ময়দানে নিয়ে আসা হল তখন ওখানকার লোকেরা মৃতের বাবার কাছে তোয়ানকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগল, এটাই ছিল মৃত্যুদন্ডের ক্ষেত্রে প্রথা। ওলামাগণ তার কাছে ক্ষমার মাহাত্ম্য তুলে ধরলেন, অন্যান্যরা তাকে রক্তপণ দিতে চাইল, কোন কোন কমান্ডার তাকে অস্ত্র দেয়ার অঙ্গীকার করল। একজন কমান্ডার তোয়ানের পক্ষে ৫০টা কালাশনিকভ ও কিছু অর্থ দেবার প্রস্তাব করল কিন্তু মৃতের বাবাকে কিছুতেই তোয়ানকে ক্ষমা করার ব্যাপারে রাজী করানো গেল না। শাস্তির দায়িত্বে থাকা কর্মীরা মৃতের বাবাকে একটি ছুরি দিল এবং হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তোয়ানকে তার সামনে আনা হল। জামার হাতা গুটাতে গুটাতে মৃতের বাবা তার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল। প্রথমেই সে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে সজোড়ে আল্লাহু আকবার বলল এরপর তোয়ানের গলায় চাকুটা ধরল।

এরপর চাকুটা সরিয়ে নিয়ে তা উপরের দিকে তুলে মৃতের বাবা বলতে লাগল, "দেখ, আল্লাহ আমাকে এই ক্ষমতা দিয়েছেন। আল্লাহ ব্যতিত আর কেউ তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তুমি সেই ব্যক্তি যে কোন আইনসঙ্গত কারণ ব্যতিত আমার ছেলেকে হত্যা করেছে।শরিয়াহ অনুসারে আল্লাহ আমাকে অধিকার দিয়েছেন আমার প্রিয় পুত্রের হত্যাকারীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার অথবা তাকে আল্লাহর উদ্দেশে ক্ষমা করে দেয়ার। প্রতিশোধের চেয়ে ক্ষমাতেই আল্লাহ বেশি সন্তুষ্ট হোন। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি, যাতে আল্লাহ আমার উপর সন্তুষ্ট হোন। এখন শেষ বিচারের দিবসে আল্লাহই তোমাকে শাস্তি দেবেন।"

এই বলে সে তার ছুরিটি ফেলে দিল আর উপস্থিত সকলে উচ্চস্বরে তাকবীর দিয়ে উঠল। অন্যান্যরা আনন্দে গুলি ছুড়ছিল এবং ছুটে এসে মৃতের বাবার হাত ও পায়ে চুম্বন করছিল। কেউ একজন এসে তোয়ানের হাত ও পায়ের বাঁধন খুলে দিল কিন্তু সে পুরো পাঁচ মিনিট কোন কথা বলল না কিংবা নড়া-চড়া করল না।

সকলে তাকে তার এই অপ্রত্যাশিত জীবনলাভে অভিনন্দন জানাতে লাগল এবং তাকে বলল তার উচিত ইসলাম ও আল্লাহর উপাসনায় একাগ্র হওয়া।

"আল্লাহ তার রহমত প্রদর্শন করেছেন। তোমার কাজের জন্য তাওবা কর এবং কখনো আর এরকম অন্যায় কাজ করার কথা চিন্তাও করো না" - তাকে এই বলা হল।

আমি নিশ্চিন্ত অনুভব করছিলাম যে এই লোক আর কখনো কোন অপরাধ করবে না, কিন্তু কিছুদিন যেতেই সে আবার খুন করল। কিছুকাল পর আমি এও শুনলাম যে সে নিজে একটা ডাকাতির ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে।

ঘটনা # ২

মৌলভী পাসানাই এর চালিত আরেকটি মামলা ছিল এরকম যেখানে পুরো একটি পরিবার ও তাদের অতিথিকে হত্যা করা হয়েছিল। গিরদি জঙ্গল ক্যাম্প থেকে মোহাম্মাদ নাবী নামে একজন লোক তার সাবেক স্ত্রী এর বোনের স্বামীর বাড়ি গিয়েছিল। তাকে তার সাবেক স্ত্রী' র বোন ও স্বামী স্বাগত জানিয়েছিল। আরেকজন অতিথিও সেই বাড়িতে এসেছিল। যখন রাতের খাওয়া পরিবেশন করা হল তখন রাত বেড়ে গিয়েছিল এবং চারদিক অন্ধকার হয়ে পড়ল। তাই মোহাম্মাদ নাবী ও অপর অতিথি রাতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল আর তাদেরকে অথিতির রুমে থাকতে দেয়া হল।অতঃপর বাড়ির অন্য সদস্যরা যার যার ঘরে ঘুমাতে চলে গেল। যখন সবাই ঘুমিয়ে রয়েছে তখন মোহাম্মাদ নাবী, যে কিনা পেশায় একজন কসাই, একটি দা নিয়ে তার ঘরে থাকা অপর অতিথিকে হত্যা করল।

এরপর সে পুরো বাড়িতে বিভিন্ন ঘরে ঘুমিয়ে থাকা পরিবারের সদস্যদের একে একে হত্যা করল। সে মোট **১১** জনকে হত্যা করলঃ একজন নারী, দুইজন পুরুষ এবং আটজন শিশু, যাদের মধ্যে একজনের বয়স মাত্র ছয় মাস। বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার আগে সে প্রতিটা মৃতদেহকে টুকরো টুকরো করে বাড়ির নিচের অংশে নিয়ে আসে। পরবর্তীতে মুসলিম যোদ্ধাগণ বেলুচিস্তানের পাঞ্জপায়ী ক্যাম্প থেকে তাকে গ্রেফতার করে এবং তাকে সেখান থেকে কান্দাহার নিয়ে আসা হয়। সেখানে সে তার অপরাধ স্বীকার করলেও এর পেছনের কারণ সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা দেয়নি। আদালতের শুনানিতে এবং কারাগারে থাকা অবস্থায় সে প্রায়শই বলত যে তাকে হত্যা করা উচিত কিন্তু সে কখনো আমাদের বলেনি কেন সে তার সাবেক স্ত্রীর বোনের পরিবারের সবাইকে হত্যা করেছিল।

সে একাধিকবার জানায় যে সে চায় তাকে মেরে ফেলা হোক। সে স্বপ্ন দেখত তার হত্যা করা সেইসব ছোট শিশুদেরকে, তার হাতে থাকত তাদের ছিন্নভিন্ন হাত-পা, চারপাশ থাকত রক্তমাখা। প্রতিদিন রাতে সেই শিশুগুলো তার স্বপ্নে এসে তাকে জিজ্ঞেস করত কেন তাদেরকে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করা হল। "আমরা কি করেছিলাম?" এই ছিল তার কাছে শিশুদের প্রশ্ন। মোহাম্মাদ নাবী ঘুমাতে পারত না; সে বিচারকের উদ্দ্যেশে বলত " আমার হৃদয়ে ভার চেপে বসে আছে, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং আমাকে শীঘ্র হত্যা করুন" । তার মৃত্যুদন্ডের আদেশ হল এবং তা কুশকাক ও নেলঘামের মাঝের নদীর তীরে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত হল। মৃতদের আত্মীয় ও পারিবারিক বন্ধুরা অতিথিদের সাথে এল।

মৃতদের দুইটি পরিবারের মধ্য থেকে দুইজন পুরুষকে নির্বাচিত করা হল যারা তাদের আত্মীয় হত্যার প্রতিশোধ নেবে। ঐ দুইজন পুরুষই ছিল মৃতদের ভাই। যখন মোহাম্মাদ নাবীকে নদীতীরে নিয়ে আসা হল তখন কেউ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল না। যদিও মৌলভী পাসানাই সাহেব উলামাদেরকে মোহাম্মাদ নাবীর জন্য দুআ পড়তে ও তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কোন মোল্লা বা অন্য কেউ তার জন্য কোন দুআর শব্দই উচ্চারণ করল না। মোহাম্মাদ নাবীর কোন আত্মীয় বা বন্ধুই তার মৃতদেহ গ্রহণ করতে আসল না। আমি বিচারক মৌলভী সাহেবের কাছে গেলাম এবং তার কাছে মোহাম্মাদ নাবীকে দুই রাকাআত নামায পড়ানোর অনুমতি

চাইলাম। আমি আরও বললাম যে তাকে কালিমা পড়ানোর নির্দেশনাও দিতে হবে। মোলভী সাহেবের অনুমতিক্রমে আমি মোহাম্মাদ নাবীর কাছে গেলাম এবং তাকে জানালাম যে মৃতদের আত্মীয়রা হত্যাকান্ডের প্রতশোধ নেয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছে। এখন তার সময় হয়েছে কাবা অভিমুখে জীবনের শেষ সালাত আদায়ের এবং শাহাদার ঘোষনা দেয়ার। কিন্তু মোহাম্মাদ নাবী আমার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল "আমাকে এই মুহুর্তে মেরে ফেলুন। আমি এখনো সেই সব হাত-পা ছিন্ন শিশুদেরকে আমার হাতের মাঝে দেখতে পাচ্ছি। আমি সালাত আদায় করতে কিংবা শাহাদা উচ্চারন করতে পারব না।"

আমি তার কথায় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমি তাকে অনুরোধ করলাম আমার কথাগুলো পুনর্বিবেচনা করতে। আমি দীর্ঘক্ষণ ধরে তার সিদ্ধান্ত বদলানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু তার কথা ছিল একটাই, "আমাকে মেরে ফেলুন" ।শেষ পর্যন্ত মৌলভী সাহেব আমাকে বললেন তার কাছ থেকে সরে আসতে। আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে অনুরোধ করে গেলাম যতক্ষণ না পর্যন্ত মৃতদের আত্মীয়রা তাকে গুলি করে হত্যা করল। সে কোন সালাত আদায় না করে এবং কোন কালিমা উচ্চারণ না করেই মারা গেল। মৃতদের আত্মীয়রা তার মৃত্যুর পর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল এবং তাদের পাগড়ী আকাশে উড়িয়ে দিতে লাগল। মোহাম্মাদ নাবী আমার কাছে জ্বলন্ত প্রমাণ যে একজন নির্দয় মানুষ সালাত আদায় না করে এবং শাহাদাহ উচ্চারণ না করেই মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ নিজে যদি কাউকে সঠিক পথে পরিচালিত না করেন তাহলে কোন রকম অভিজ্ঞতা বা কষ্টভোগই তাকে সঠিক পথের নির্দেশনা দিতে পারবে না।

উৎস : My Life with the Taliban (by Mullah Zaeef) ; page 75-78

২০ বছর নিরবিচ্ছিন্ন যুদ্ধের পর মানুষ খুশি হতে শুরু করেছিল এজন্য যে তাদের দেশটি এখন অনেক বেশি স্থিতিশীল, যদিও তা ছিল বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশগুলোর একটা।

ওসামা তার লোকদের ব্যবহার করে তালিবানদের বিরোধী দলের নেতাকে হত্যা করে, এজন্য তালিবানরা তার কাছে কৃতজ্ঞ ছিল। কিন্তু ওসামার ছিল আরও অনেক সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য, যা তখনও অর্জিত হয়নি।

অধ্যায় ৩ : (২০০১-২০০৫)

৯/১১ যুগ ও নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার

বিশ্বে একমাত্র সুপারপাওয়ার হিসেবে টিকে থাকা অবস্থায় ২০০০ + এর প্রথম দিক থেকে আমরা একটি নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার এর উত্থান দেখতে পাই, যা কিনা বিশ্বের ১% এলিটদেরকে (জায়নিস্ট) – যারা বিশ্বের অন্যতম সেরা ধনী লোকদের অন্তর্ভুক্ত, তাদেরকে অদম্য ক্ষমতা দিচ্ছে US এর বিস্তার ও আধিপত্যের মাধ্যমে পুরো বিশ্বের অর্থনীতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য।

৯/১১ এর পূর্ববর্তী ঘটনা

আল কায়েদা বিভিন্ন সেনসিটিভ এরিয়া টার্গেট করে, যেমন মার্কিন এম্বাসি (কেনিয়া), যুদ্ধ জাহাজ (the US cole in Yemen) এবং সোমালিয়াতে মার্কিন যুদ্ধ হেলিকপ্টার। ওসামা বিন লাদেন এবং আয়মান আল জাওাহিরি (দুজনই আল কায়েদা নেতা) জানতেন যে মার্কিনীরা সহজে মুসলিমদের ভূখণ্ড ছাড়বে না একারনে যে মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে তাদের বিলিয়ন ডলারের আর্মি বেইস আছে এবং এসব ভূখণ্ডের বিভিন্ন রিসোর্স যেমন তেল, গ্যাস ও খাবার তাদের নিজেদের দেশে নিয়ে তা নামমাত্র দামে বেচবে ওই মুসলিম ভূখণ্ডের দালাল সরকারের মাধ্যমে, যারা কিনা সাম্রাজ্যবাদী যুগ থেকেই মুসলিম ভূখণ্ড গুলো দখল করে আছে (প্রায় ২০০ বছর আগে থেকে)। তাই ছোটখাট কোন আক্রমণ করে USA আর পশ্চিমা শক্তিকে সহজে মুসলিম ভূখণ্ড থেকে বিতারিত করা যাবে না।

ওসামা বিন লাদেন বুঝতে পেরেছিলেন যে পশ্চিমা শক্তিকে বিতারিত করার জন্য একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রকৃত ব্যাপারে মুসলিমদের চোখ খুলে দেওয়া, তা হল – মার্কিনীদের নেতৃত্বে থাকা পশ্চিমা শক্তিগুলো মুসলিম ভূখণ্ডগুলো আগে থেকে দখল করে আসছে। আর এটি কেবলমাত্র পশ্চিমা শক্তিগুলোকে মুসলিম ভূখণ্ডে ফিজিক্যাল যুদ্ধে প্রলোভিত করার মাধ্যমেই সত্যিকার অর্থে তাদের বুঝানো যাবে, যা কিনা মুসলিমদের মধ্যে তাগুতি শক্তির হাত থেকে নিজেদের ভূখণ্ডকে রক্ষার জন্য জিহাদি জাগরণের কারন হবে, যেমনটি ঘটেছিল প্রায় ২০ বছর পূর্বে রাশিয়ান সুপার পাওয়ার এর বিপক্ষে।

আল কায়েদার সুদীর্ঘ লক্ষ্য হল মার্কিন ইন্টারেস্টকে টার্গেট করার মাধ্যমে মুসলিমদের ভূখণ্ডে তাদের ফিজিক্যাল যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রলোভিত করা। আর সেই যুদ্ধ পশ্চিমা শক্তির জন্য তুলনামূলক কঠিন হবে কারন তারা এমন এক ভূখণ্ডে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে যার জনগণ তাদের ভূখণ্ড সম্পর্কে তুলনামূলক ভাল জানে।

১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১

ওসামা বিন লাদেন মার্কিনীদেরকে সুদান, সোমালিয়া অথবা এমনকি আফগানিস্তানের সাথে যুদ্ধ শুরুতে প্রলুব্ধ করতে পুরোপুরি সফল হোন নি।

মার্কিনীদের অবস্থান বিশ্বের ওপর প্রান্তে হওয়ায় এবং আল কায়েদার কাছে কোন লং রেঞ্জ এর মিসাইল বা যুদ্ধ বিমান না থাকায় ওসামা প্ল্যান করলেন "দি গ্রেট এভিল" মার্কিনীদেরকে আক্রমণ করতে। তিনি এক্ষেত্রে "সাপের মাথা" টার্গেট করলেন। এই "সাপের মাথা" খতম করা হলে মুসলিম ভূখণ্ডের সব দালাল শাসক আর ইসরাইল স্বাভাবিক ভাবেই দুর্বল হতে থাকবে এবং শীঘ্রই পতনের দিকে যাবে। তাই আমেরিকার অর্থনৈতিক কাঠামোকে (তাদের আসল শক্তি) টার্গেট করাই ছিল ওসামা'র প্রধাণ লক্ষ্য।

ওসামা নিউ ইয়র্ক আর টুইন টাওয়ার আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন কারন এটি ছিল বলতে গেলে মার্কিন অর্থনীতির কেন্দ্র এবং পেন্টাগনের নিকটবর্তী (এটাও টার্গেটের মধ্যে ছিল)। ওসামা এটা ভাল করেই জানতেন যে তাদের ইনোসেন্ট মানুষ মারা যায় তাহলে তারাও হাজার হাজার মুসলিম নারী ও শিশু হত্যা করবে অথবা ক্ষুধা'র কারনে মৃত্যুর পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে, যা তারা ইতিমধ্যে করে দেখিয়েছে উপসাগরীয় যুদ্ধে যেখানে অর্ধেক মিলিয়ন ইরাকি না খেতে পেরে মারা গিয়েছিলো। তিনি কুরআনের এই আয়াতের কথা মাথায় রেখেছিলেন : "তোমরা একসাথে মুশরিকদের বিরুদ্ধে কিতাল কর ঠিক তেমনিভাবে, যেমনিভাবে তারা তোনিভাবে, হত্যা করে।" (সূরা তওবা, ৯ : ৩৬) ; ওসামা 'র সমীকরণটি এই আয়াত সমানে সমান করে দেয়। ওসামা বলতেন "যদি তারা (কুফফাররা) আমাদের এক লাখ ইনোসেন্ট লোক হত্যা করে, তাহলে আমাদের তাদের একই ক্ষতি করার অধিকার আছে।" ইসরাইল প্রকৃতপক্ষে এই ফিলোসোফি ইউজ করে প্যালেস্টাইনিয়ানদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে।

একমাত্র অপশন বাকি ছিল ৯/১১ আক্রমণ। এটা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণ যা নিকট ভবিষ্যতের বিশ্ব ইতিহাস পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে বিরাত ভুমিকা রাখে।

৯/১১ সম্পর্কে কিছু ষড়যন্ত্রমূলক প্রচার – সেগুলোর জবাব

৯/১১ সম্পর্কে প্রচুর ষড়যন্ত্রমূলক প্রচার দেখা যায়, তাদের মধ্যে অনেক গুলোর ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত কথাও শুনা যায়। এই যেমন, টাওয়ার এর সাথে বিমান এর সংঘর্ষের পূর্বেই টাওয়ার গুলো এমনভাবে বিস্ফোরিত হয় যেন তাদের ভিতর আগে থেকেই বোমা পেতে রাখা ছিল। কিন্তু এটা ওসামার প্ল্যান এর সাথে মিলে না। তাহিলে কি সত্যিই ওসামা একজন এজেন্ট ছিলেন যেমনটা অনেকে দাবী করেন ?

উত্তরটি খুবই সিম্পল। ওসামা এই অ্যাটাক করার আগে কয়েক বছর ধরে এটা নিয়ে প্ল্যান করে আসছিলেন। এটা কোন “বিগ সিক্রেট” কিছু ছিল না এবং আমেরিকান সোর্স থেকে প্রাপ্ত প্রচুর রিপোর্ট থেকে ক্লিয়ার হয় যে CIA মেম্বাররা এই প্ল্যান গুলোর ব্যাপারে জানত আর তারা বাস্তবে অ্যাটাক হওয়ার আগ পর্যন্ত জেনেশুনেই তার প্রতিরধে কোন পদক্ষেপ ন্যায় নি। এমনকি অনেক FBI মেম্বার CIA এর এই চুপ থাকা ও তাদেরকে এই ব্যাপারে কিছু না জানানোর জন্য CIA এর সমালোচনা করে যে অ্যাটাক করার কয়েক বছর আগে সন্ত্রাসীরা (তাদের দৃষ্টিতে) আমেরিকাতে ফ্লাইং লেসন এর জন্য প্রবেশ করেছিলো।

যদিও আপাতদৃষ্টিতে একে আরেকটি ষড়যন্ত্র বলে মনে হয়, মনে রাখতে হবে CIA এর অনেক হাই লেভেল এর মেম্বার সেই ১% এর জন্য কাজ করে যাচ্ছে , যারা (১%) হল বিশ্বের চরম ধনী ব্যাবসায়ী যারা ইহুদিপন্থি ইসরাইলকে সাপোর্ট করে। ইন শা আল্লাহ্ এটি এই বইের পরবর্তী অধ্যায় গুলোতে আরও পরিষ্কার হবে , কিন্তু এই মুহূর্তে দুটি পয়েন্ট পরিস্কার :

(১) CIA এর ওই মেম্বাররা ওই অ্যাটাক এর তথ্য জানার পর তা গোপন রাখার কারনে তাদেরকে বহিস্কার করা হয়নি, যদিও সেটার কারনে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষতি করেছিলো এবং হাজার হাজার আমেরিকানরা নিহত হয়েছিল।

(২) এটি কি একটি বিস্ময়কর ব্যাপার না যে ৯/১১ মধ্য প্রাচ্যে ফুল স্কেল গ্লোবাল ওয়ার এর দরজা খুলে দিবে, যা কিনা শীঘ্রই “গ্রেটার ইসরাইল” ফরমেশনের একটি কারন হবে ? (প্যালেস্টাইন,সিরিয়া,মিসর এবং ইরাক নিয়ে)

আল কায়েদার হাইজ্যাক করা বিমান টুইন টাওয়ার অ্যাটাক করলো (এবং জায়নিস্টদের গোপনভাবে পাতিয়ে রাখা বোমগুলোও প্রায় একই সাথে বিস্ফোরিত হল) – আল কায়েদার সদস্যরা আফগানিস্তানে রেডিও থেকে এই ইভেন্ট সম্পন্ন হওয়ার খবর পেলেন, তাদের অনেকেই সিজদা করে পরাক্রমশীল আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া স্বরূপ সিজদা করলেন।

“তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবেই, এমনকি যদি তোমরা উচু কোন দুর্গেও থাকো।” (সূরা নিসা, ৪ : ৭৮)

বুশ এই ব্যাপারে ওসামাকে সরাসরি দোষারোপ করলো। আফগানিস্তান তাদের নতুন টার্গেট হল এবং প্রতিক্রিয়ায় কেউই আমেরিকাকে আফগানিস্তানে তাদের যুদ্ধের ব্যাপারে কোন কিছু বলে বাধা দিল না।

<u>এটি কি ওসামাকে তাদের এজেন্ট বানিয়েছে ?</u>

সত্যি বলতে – না,বরং CIA এর জায়নিস্ট মেম্বাররা ঘটনাটি কোন প্রতিরোধ ছাড়াই ঘটতে দিয়েছিলো, তারা জানত যে ওসামা বিন লাদেন নামের এই মানুষটি আমেরিকার বিরুদ্ধে গত কতেক বছর যাবত যুদ্ধ চালিয়ে আসছে

(ইয়েমেনে US cole ship বোম্বিং, সোমালিয়ায় ব্ল্যাক হক ডন এবং কেনিয়ায় USA এমব্যাসি বোম্বিং)। এগুলো জানার পরও তারা ওসামাকে থামায় নি কারন তারা জানত আমেরিকান জনগনের জন্য এসব ছোটখাটো অ্যাটাক যথেষ্ট নয় একটি ফুল স্কেল ও লং টার্ম ওয়ারকে বৈধতা দানের জন্য।

CIA এর জায়নিস্ট মেম্বাররা ৯/১১ এর মতো একটি বড় ধরনের অ্যাটাকের আশা করছিলো যাতে তারা মধ্য প্রাচ্যে তাদের জায়নিস্ট প্ল্যান বাস্তবায়নের ব্যাপারটিকে আরও বেশী করে বৈধতা দিতে পারে। ৯/১১ কোন বাধা ছাড়াই সংঘটিত হতে দিয়ে এবং টাওয়ারের ভিতর বোম লুকিয়ে সেটআপ করে (যা কিনা বিমান আঘাতের পূর্বেই বিস্ফোরিত হয়েছিল) এই ঘতনাকে তার বিশ্ববাসীর কাছে আরও জঘন্যভাবে উপস্থাপন করলো। তা এমন জঘন্য ছিল যে তা বৈধতা দিল আমেরিকার নেতৃত্তে যুদ্ধগুলোর ব্যাপারে, যা কিনা চলবে এক অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।

যদিও ওসামা আর জায়নিস্টদের প্ল্যান ছিল একই – মধ্য প্রাচ্যে ফ্রেশ একটা যুদ্ধের সূচনা করা, কিন্তু তাদের ইন্টেনশন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন – একজন চেয়েছিলেন ইসলামের পুনর্জাগরণ, ওপর পক্ষ চেয়েছিল মুসলিম ভূখণ্ডে তাদের আরও বেশী সার্বভৌম আধিপত্য। জায়নিস্টরা ওসামাকে কোন সত্যিকারের হুমকি হিসেবে মনে করে নি কারন তার সাথে মাত্র কয়েকশ মুসলিম আর কিছু দরিদ্র তালিবান ছিল। এরপরও পরবর্তীতে এই ৩০০ জনের কিছু অধিক মুসলিম পুরো বিশ্বের জিও-পলিটিক্স পরিবর্তন করে দিল, যেমনটি বদরের ৩১৩ জন সাহাবী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ইসলামের নতুন ইতিহাসের সুচনা করেছিলেন, যদিও জায়নিস্টরা তাতে অবাক হয়েছিল।

সামনের বছরগুলো আমাদের জানিয়ে দিবে কিভাবে ওসামার সাথে থাকা ৩০০ জনের কিছু বেশী মুসলিম ছোট দল থেকে ক্রমে বিবর্ধিত হবে এবং জায়নিস্ট এজেন্ডার পুতুল গুলোকে ভালমত বুঝে নিবে এবং বৈশ্বিক জীবন বিধানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে যা এখন অদমনীয়।

তালিবানের হোঁচট এবং তোরা বোরা পাহাড়ের যুদ্ধ

“আল্লাহ্ আমাদের জন্য একটি অঙ্গীকার করেছেন (দ্বীনের বিজয়) এবং বুশ ও আমাদের ব্যাপারে অঙ্গীকার করেছে (পরাজিত করার ব্যাপারে), আমরা শিগ্রই দেখতে পাব কার অঙ্গীকার সত্য হয়।” - মোল্লা ওমর (আমেরিকার আফগানিস্তানে হামলার পূর্বে)

আফগানিস্তানে আল কায়েদার ট্রেইনিং ক্যাম্পে একটি ক্রুজ মিসাইল আঘাত হানল। ২০১১ এর অক্টোবর মাসে আফগানিস্তানের নিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকা লাঞ্ছিত হল।

প্রাথমিক হামলার কয়েক মাসের মধ্যে তালিবানের শাসন পুরোপুরি ধ্বংস হল এবং আফগানিস্তান আরও একবার ওয়ার জোনে পরিনত হল (এখন এর তৃতীয় দশক চলছে)। তখন কারজাইকে মার্কিনীরা খুব দ্রুত আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেয়, অপরদিকে তালিবান মুজাহিদরা গ্রাম্য অঞ্চলগুলোতে চলে যায়। বেশিরভাগ

তালিবান ছিল খুবই সাধারণ মুসলিম যারা আফগানিস্তানে ইসলামি শারিয়াহ’র প্রতিষ্ঠা চাইতো – তারা তাদের পরিবার অথবা পাহাড়ি এলাকাগুলোতে চলে যায়। প্রচুর পরিমাণ বিমান হামলা আর বোম পুরো আফগানিস্তানকে ভাসিয়ে দিচ্ছিল, ওই সময় আল কায়েদা ও তালিবান নেতারা হিন্দু কুশ পাহাড় এলাকায় চলে যান, যা বমা হামলা ও বিমান হামলা প্রতিরোধে নিরাপদ স্থান। তারা এই তুষারময় পাহারি এলাকায় কোন আগুন জালানো থেকে বিরত ছিলেন যাতে তারা সফলভাবে লুকিয়ে থাকতে পারেন এবং তাদের সনাক্ত করা না যায়।

তোরা বোরা পাহাড় : সিংহের গুহা

৮০’র দশকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন সময়ে ওসামা তোরা বোরাতে একটি গুহা তৈরি করেছিলেন, যাকে "সিংহের গুহা" (মা’সাদাহ) নামে ডাকা হত। এটি ছিল পাক-আফগান বর্ডারের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি বড় গুহা যা তিনি হেভি কন্সট্রাকশনের যন্ত্র দিয়ে তৈরি করেছিলেন, এটিই পরবর্তীতে তাকে আর তার অনুসারীদের নিরাপত্তা দিতে কাজে আসে। প্রায় ১০০০ লোক দাড়ানোর উপজুক্ত ছিলে এই গুহা।
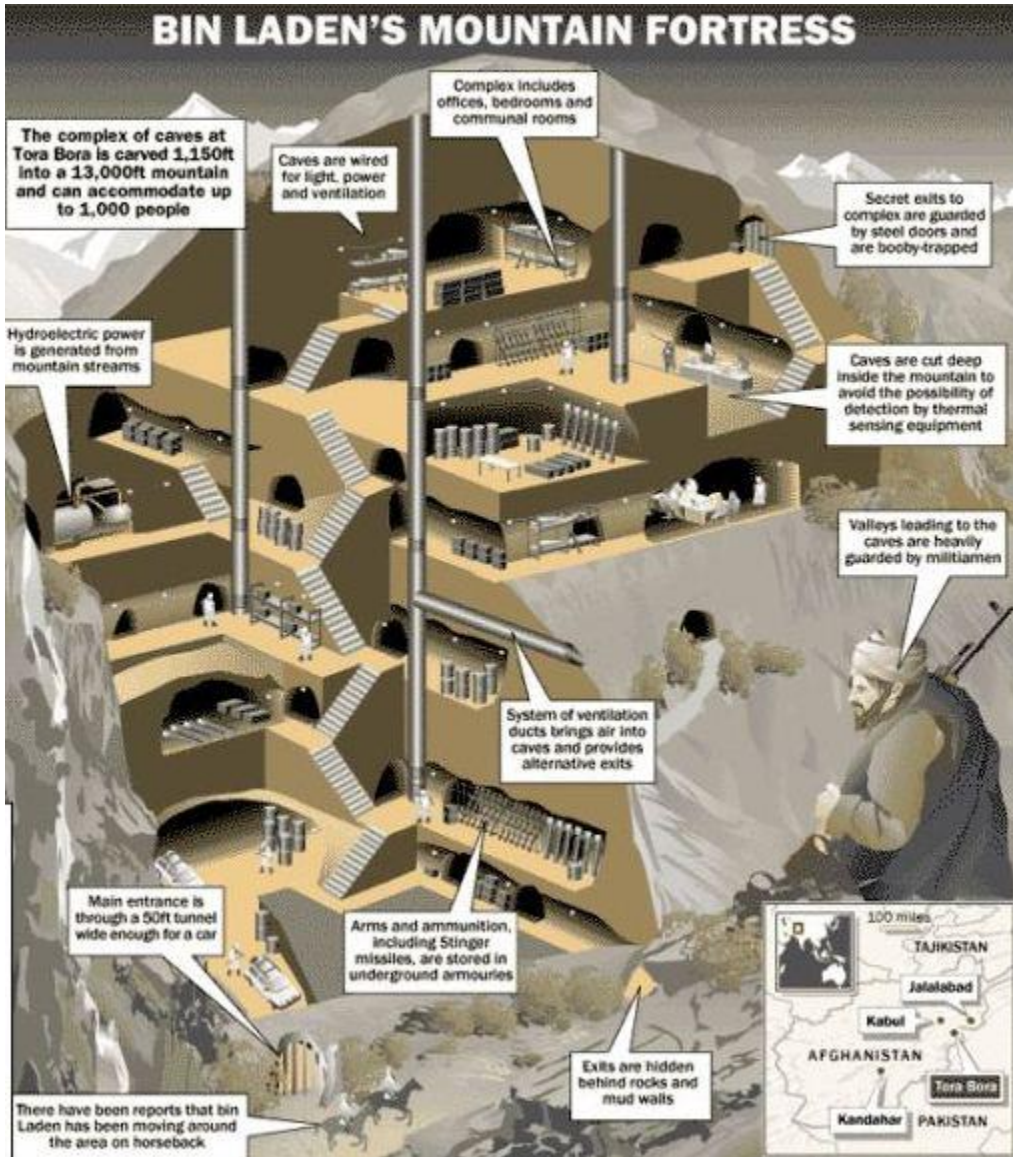
ওসামা তার সেই “সিংহের গুহা” তে আরও একবার প্রবেশ করলেন তার অনুসারীসহ নিরাপত্তা ও কৌশল অবলম্বনের জন্য এবং এখানে শুরু হল এক নতুন যুদ্ধ – তোরা বোরা পাহাড়ের যুদ্ধ।

ওসামাকে দেখতে পাওয়া গেল

তোরা বোরাতে আত্মগোপনের পূর্বেই আমেরিকান সোর্স সংকেত দেয় যে আমেরিকান এয়ার ফোর্স ওসামাকে দেখেছে এবং তাকে টার্গেট করার জন্য প্রস্তুতও হয়ে আছে কিন্তু কমান্ডারদের অ্যাটাক করার অনুমতি সবসময় দেরি করে দেওয়ার কারনে তারা সক্ষম হত না।

Michael Scheuer এর মতো প্রাক্তন CIA মেম্বাররা অনুমতি দিতে সবসময় দেরি করার ব্যাপারে প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলো কিন্তু তারা এই ব্যাপারে কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা পান নি।

কন্সপাইরেসিস্টরা বলে যে পারমিশন না দেওয়ার কারন, ওসামাকে জীবিত রেখে ভবিষ্যতে অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে তাদের আধিপত্যের জায়োনিস্ট এজেন্ডা বাস্তবায়নের বৈধতা দেখানো যাবে। ওসামাকে হত্যা করা হলে ভবিষ্যতে ইরাক এবং অন্যান্য “আশংকাজনক সন্ত্রাসী জাতি”’র বিরুদ্ধে যুদ্ধে মানুশের কাছে নীতিমুলকভাবে বৈধ হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না।

তোরা বোরার যুদ্ধ

যখন ওসামা তোরা বোরাতে গেলেন, তখন তার সাথে প্রায় ৩০০ জন সাথী ছিল (দেখুন : “তোমরা দ্বিতীয় বদরের সৈনিক”)। ওসামার এই ৩০০ সাথী আমেরিকা’র আফগান ভাড়াটেদের সাথে জিহাদ করছিলেন, যারা আমেরিকান স্পেশাল ফোর্স এর সাথে একত্রিত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলো। এই আফগান ভাড়াটেদের অনেকেই ওসামার সেই সাথীদের সাহসিকতা নিয়ে এই বলে অভিযোগ করেছিলো যে তারা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে চায় এবং তারা যদি তাদেরকে আটক করার সময়ে উপস্থিত হয় তখন তারা ওই ভাড়াটে সৈন্যদের দিকে গ্রেনেড ছুড়ে দেয় (খুব কাছাকাছি চলে এলে) যাতে তাদেরকে আটক করা না যায়। (তারা ক্ল্যাসিকাল ইসলামিক স্কলারদের সেই স্টেটমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে এটা করেন, যাতে বলা হয়েছে যে শত্রুকে হত্যা করার মাধ্যমে নিজে হত্যা হওয়া এটার থেকে ভাল যে হত্যাকারী অর্থাৎ মুজাহিদকে বন্দী করে অপমান-নির্যাতন করা হবে, এবং এই ধরনের মৃত্যু সেটা থেকে অপেক্ষামূলক ভাল – কাফিরের হাতে বন্দী হতে হবে এরপর চরম নির্যাতনের কারনে মুসলিমদের গোপন তথ্য প্রকাশ করে দিবে, যা চরম নিন্দনীয় ব্যাপার)।

আমেরিকা ইরাকের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ শুরু করলো যেমনটি তারা আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে করেছিলো, আর ওসামা এটিই চেয়েছিলেন। তিনি আমেরিকান ফোর্সকে যতটুকু সম্ভব তাদের দেশ (আমেরিকা) থেকে বের করে নিয়ে আসতে চাচ্ছিলেন এবং আমেরিকা তাদের মধ্যে বদ্ধমূল দাম্ভিকতার সাথে অন্ধভাবে ওসামার পাতান ফাদে পড়ল। এটি ভবিষ্যতে আমেরিকার পতনের অন্যতম কারন হবে।

ওসামার সাথীরা তোরা বোরা পাহাড়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ চালাতে লাগলেন একটি অচলাবস্থা সৃষ্টি'র আগ পর্যন্ত (কোন পক্ষই জয়লাভ করেনি)। ওসামা তার সাথীদের বললেন যে যুদ্ধ বিরতিতে সক্ষম হলে তাকে ও তার সাথীদেরকে এই পাহাড় ছেড়ে অন্য কোন পাহাড়ি এলাকাতে চলে যেতে হবে।

ওসামার সাথীদের মাথায় একটি আইডিয়া এলো – তারা তাদের শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দিল যে তারা যুদ্ধবিরতিতে রাজী আছেন এবং তারা পরের দিন সকালে তোরা বোরা পাহাড় থেকে বেরিয়ে এলেন। আমেরিকা সমর্থিত আফগান সৈন্যরা এই ব্যাপারে সানন্দে রাজী হল (প্রকৃতপক্ষে তাদের এই যুদ্ধবিরতির প্রয়োজন ছিল)। এর আগের রাতে ওসামা আর তার কিছু সাথীরা তোরা বোরা পাহাড় থেকে অতি গোপনে বেরিয়ে পাকিস্তান বর্ডারে চলে গেলেন।

আমেরিকা যখন সমগ্র আফগানিস্তানে আক্রমণ করলো, তখন ওসামা আর তার সাথীরা পাকিস্তান বর্ডারে নিরাপদে থেকে তাদের পরবর্তী কৌশল ঠিক করতে লাগলেন।

<u>এর ভবিষ্যৎ পরিনাম</u>

আমেরিকার নেতৃত্বে ঘটা এই দখদারিত্বের সম্ভাব্য পরিনাম যা হবে –

* তালিবান সাময়িকভাবে শাসনক্ষমতা হারাবে এবং ভবিষ্যতে আরও অধিক শক্তিশালী ফোর্স হিসেবে আবির্ভূত হবে,

* মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমা বিরোধী ও আমেরিকা বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পাব ,

* আমেরিকা এবং ইউরোপ ট্রিলিয়ন ডলারের ঋণের ফাদে পড়বে, এবং

* আল কায়েদা ও তালিবানদের নতুন জেনারেশনের জন্ম হবে।

এসবই হল ওসামার দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্যের জন্য সুবিধা। নিকট ভবিষ্যতে এটি আমেরিকার পতনের অন্যতম কারন হবে।

<u>রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এক মুজাহিদকে স্বপ্নে জানালেন, "তোমরা দ্বিতীয় বদরের মুজাহিদ"</u>

ক্বারি বদর-উজ-জামান বদরের (যিনি তিন বছর জেলে ছিলেন এবং সাম্প্রতিক গুয়ান্তানামো থেকে মুক্তি পেয়েছেন) কাছ থেকে নেওয়া ইন্টারভিউ থেকে কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হল। ইন্টারভিউটি ARY ONE টিভিতে "Views on News" নামের এক প্রোগ্রামে প্রচারিত হয়েছিল ২৫ই মে, ২০০৫ এ। ইন্টারভিউটি উর্দুতে ছিল, পরবর্তীতে এক ভাই সেটা ইংলিশে অনুবাদ করেন। বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য তা বাংলায় অনুবাদ করা হল।

ইন্টারভিউ এর ট্রান্সলেশন :

আমরা (গুয়ান্তানামো'র বন্দীরা) যেখানে নিয়মিতভাবে আল্লাহর ইবাদতে ব্যস্ত থাকতাম এবং এভাবে আল্লাহ'র সান্নিধ্যে নিজেদের নিয়োজিত রাখতাম। অনেকেই রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে স্বপ্নে সুসংবাদ দিয়ে বলতে দেখেছিলেন যে বিজয় অতি নিকটে।

এবং তারা স্বপ্নে এটাও দেখেছিলেন যে ঈসা (আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে বলেছেন যে যারা নিজেদের নাসরানি (খ্রিস্টান) বলে দাবী করে তারা সঠিক পথের উপর নেই তারা ভুল পথে এবং শীঘ্রই তারা ধ্বংস হবে।

এক মুজাহিদ আমাকে বলেন যে তিনি একবার তীব্র শীতে বারগাম কারাগারে এ ঘুমিয়ে ছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখতে পান যে ঈসা (আলাইহি ওয়া সালাম) তার কাছে আসলেন, তার এক হাতে কুরআন এবং অপর হাতে ইঞ্জিল (বাইবেল) ছিল। মুজাহিদ ঈসা (আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আলিঙ্গন করতে চাইলেন এবং চুমো দিতে চাইলেন। কিন্তু ঈসা (আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) পিছনে সরে গেলেন। কেউ ঘোষণা করলেন যে লোকটি কুবা'র গুয়ান্তানামো'র একজন মুজাহিদ। এরপর ঈসা (আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার হাত ধরে মুসাহাফা করলেন এবং আমার কপালে চুমু দিলেন। তিনি আমার হাত ধরে তার হাতের মধ্যে রাখলেন এবং আমাকে বললেন, "বিজয়ের ব্যাপারে কোন দুঃখ কর না, বিজয় খুব নিকটে এবং নাসারা (খ্রিস্টান) ধংশ হবে। এবং আমি আসছি।"

এরপর মুজাহিদ আমাকে বললেন যে এরপর যখন ঈসা (আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) তার হাত ধরে মুসাহাফা করলেন, আমি জেগে উঠলাম। ঘুমানোর কক্ষটি মোটেও উষ্ণ ছিল না কিন্তু আমি ঘামছিলাম।

এক আরব মুজাহিদ স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখলেন এবং রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন "তুমি আহলে বদরের অন্তর্ভুক্ত" (যারা বদর জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন)। মুজাহিদ রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললেন যে বদরের সাহাবীরা তো অনেক আগেই চলে

গিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, "আনতুম মিন আহলে আল বদর আস-সানী (তুমি বদর এর দ্বিতীয় জন) এবং বদর এর সাহাবিদের থেকে তোমার মর্যাদা অত কম নয়।"

নোট : বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩১৩ জন সাহাবী ছিলেন পুরো ইসলামের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ মুসলিম।একইভাবে দেখা যায়, দাউদ (আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে জালুতের বিরুদ্ধে জিহাদে প্রায় একই সংখ্যক মুজাহিদ ছিল।

একইভাবে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে শেষ যুগে (বলা যায়, বর্তমানে) তার সাহাবিদের সমান সংখ্যক অনুসারী পুরষ্কারের ক্ষেত্রে সাহাবীদের একই মাপের হবে। মুজাহিদের এই সত্য স্বপ্ন এই বাস্তবতাকে আরও দৃঢ় করে।

অধ্যায় ৪: (২০০২-২০০৫) – পাকিস্তান

<u>পাক-আফগান বর্ডার</u>
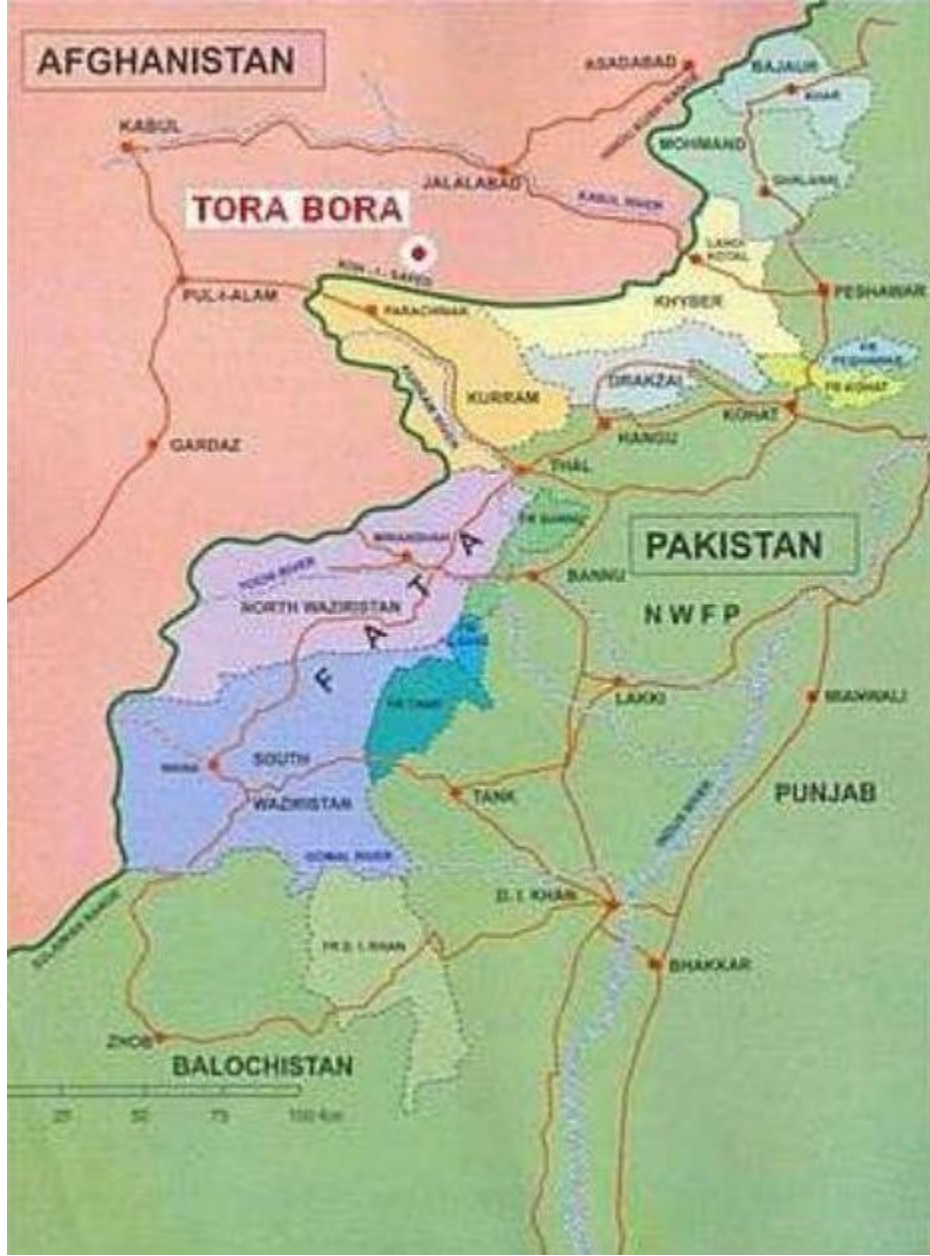
আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যকার বর্ডারটি ১০০০ কি.মি. এর কিছু পরিমাণ দীর্ঘ, তাই সীমান্ত নিরাপত্তাকর্মী ও কোন উদ্যোগের মাধ্যমে এই বর্ডারের মধ্য দিয়ে মানুষের অপর ভূখণ্ডে চলে যাওয়া রোধ করা প্রায় অসম্ভব।

এছাড়া পাক-আফগানে বসবাসকারী লোকেরা এই বর্ডারকে স্বীকৃত দেয় না যেহেতু তারা কয়েক শতাব্দী ধরে সেখানে বাস করে আসছে, সম্ভবত সেটা হাজার বছরও হতে পারে। তাই প্রায় একশ বছর আগে সাম্রাজ্যবাদীদের সৃষ্টি করা বর্ডার তারা আমলে নেয় না।

এমনকি বর্ডারে বসবাসকারী লোকেরা তাদের ওই স্থানে পাকিস্তান সরকারের শাসনও স্বীকৃত দেয় না। তারা পুরোপুরি পাকিস্তান সরকারের অধীনে নয়। তারা নিজেরা তাদের গোত্রের জন্য আইন তৈরী করে এবং যদি পাকিস্তান সরকার তাদের উপর কোন আইন চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তবে তারা অস্ত্র হাতে লড়াই করার জন্য তৈরী থাকে। এসব কারনে, পাকিস্তান সরকার এই সীমান্তের অংশটি নিয়ন্ত্রন করার সাহস করে না। এর বিনিময়ে এখানকার লোকেরাও পাকিস্তান সরকারের কোন ক্ষতি করে না।

সীমান্তে বসবাসকারী লোকেরা তাদের ভাইদের মতো। এসব লোকেরা তাদের প্রচণ্ড সাহস, প্রতিরক্ষামূলক ব্যাপার আর স্বাধীন থাকার ইচ্ছা – এসব কিছুর জন্য বাইরের লোকদের কাছে পরিচিত।

আমরা যদি ব্যাপারটিকে আরও ভালভাবে বুঝতে চাই এবং রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলের দিকে তাকাই তাহলে দেখব উজবেকিস্তান,চেচনিয়া,যিয়াং যেং (বর্তমানে চীনের অংশ),তুর্কমেনিস্তান এবং ইরানের কিছু অংশ – এখানে বসবাসকারী লোকদেরও একই বৈশিষ্ট্য। এসব অঞ্চল খুরাসানের অন্তর্ভুক্ত। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শেষ যুগ সম্পর্কিত ভবিষৎবাণী খুরাসান সম্পর্কিত, আমরা তা পরবর্তী একটি অধ্যায়ে দেখব।

<u>পাকিস্তানে বসতি স্থাপন</u>

ওসামা বিন লাদেন, আয়মান আল জাওাহিরি এবং তাদের সাথীরা পাকিস্তান বর্ডারে চলে গেলেন। পাহাড়ি এলাকার মাটিতে পড়ে থাকা অনেক লিফলেট দেখা গেল। লিফলেটগুলো আয়মান আর ওসামার ছবি সম্বলিত ছিল যাতে লেখা ছিল – " আপনারা যদি কেউ এই দুই জনের কোন একজনকে দেখেন তাহলে এই নাম্বারে কল দিবেন..... " এবং এতে ধরিয়ে দেওয়ার পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে মিলিয়ন ডলার ঘোষণা করার কথা লিখা ছিল। যে নাম্বারে কল করার কথা বলা হয়েছিল তা ছিল আমেরিকান ফোন নাম্বার। যদিও কেউ তাদের দেখে থাকে এবং তাদের চিনতে পারে,তাহলে পাহাড়ে বসবাস করা এমন কোন আফগান আমেরিকাকে কল দিতে সক্ষম হবে ? *

পাকিস্তান সীমান্তের প্রতিবেশীরা তাদের নতুন অতিথিদের আশ্রয় দিতে ইচ্ছুক ছিল, যেমনটি তারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় আফগান ও আরবদেরকে দিয়েছিলো। আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয় দেওয়া তাদের একটি গোত্রীয় বৈশিষ্ট্য, এমনকি যদি শত্রুও হয়। আফগানরা এই গোত্রীয় বৈশিষ্ট্যকে বলে 'পশতুনওয়ালা' – এক অলিখিত আইন যেটা সব গোত্রীয় আফগান আর তাদের মতো লোকরা এর ব্যাপারে সম্মত।

তখন তালিবান আর আল কায়েদার কেউ কেউ আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পাহাড়ে, কেউ কেউ পাকিস্তান সীমান্তে অথবা কেউ কেউ ইরাকের মতো অন্য কোন ভূখণ্ডের দিকে চলে যাচ্ছিলো। আমেরিকার তীব্র বিমান হামলা ও বোম্বিংয়ের জন্য তারা আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে কিছু সময় বিরত ছিলেন কারন ওইসময় তাদের ঘাঁটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং শুধুমাত্র একে-৪৭ আর হালকা অস্ত্র থাকে, তাদের কোন স্টিঙ্গার মিসাইলও ছিল না (CIA মাসুদকে আফগান যুদ্ধের সেনাপতিদের কাছ থেকে তা কিনার জন্য অর্থ দিয়েছিলো)। ওই সময় আল কায়েদা ও তালিবানদের প্রধান ফোকাস ছিল নতুনভাবে একত্রিত হয়ে নতুন কৌশল ঠিক করা।

পাকিস্তানে নিজেদের টিকিয়ে রাখা

পাকিস্তানে চলে যাওয়া আল কায়েদার সাথে আফগান তালিবানদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারনে তারা ঠিক করলেন যে তারা পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় তাদের লোক ছড়িয়ে দিয়ে তাদের টিকে থাকা নিশ্চিত করবেন।

যাদেরকে পাকিস্তানের বর্ডারে ওই গোত্রদের কাছে পাঠানো হল তারা বর্ডারের গোত্রদের সাথে বন্ধুত্ব ও ঐক্য স্থাপন করলেন – তাদেরকে ধর্মীয় উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ দিলেন। কেউ কেউ করাচী'র মতো বিভিন্ন শহরে তাদের কার্যক্রম, দক্ষতা এবং যোগাযোগ ক্ষমতা নিয়ে ছড়িয়ে পরলেন (সেই গোত্রীয় এলাকাগুলোতে কোন ইন্টারনেট সার্ভিস নেই এবং টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা নিম্ন মানের)। কেউ কেউ ইরাকে (তখন যুদ্ধ চলছিল) এবং কেউ কেউ ইয়েমেন এবং ফিলিপাইন এর মতো পূর্ব-দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোতে আল কায়েদার নতুন আঞ্চলিক বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য হিজরত করলেন। তাদের সবার উদ্দেশ্য হল তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও দক্ষতা পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া, একাজে কেউ তাদের থামিয়ে রাখতে পারে নি। এই হাতেগোনা কয়েক ভাইদের আন্তরিক প্রচেষ্টা বুঝা গেল ২০০৫ এর পর – আল কায়েদা এরাবিক পেনিনসুলা (AQAP – ইয়েমেন ভিত্তিক), আল কায়েদা ইন দ্যা ইসলামিক মাগরিব (AQIM – সাহারা মরুভূমি ও ইউরোপ), আল কায়েদা ইরাক (AQI - ইরাক) এবং পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আরও অনেক যাদের নাম আল কায়েদার সাথে যুক্ত নয় (নতুন কোন নাম রাখার উদ্দেশে) কিন্তু তারাও আল কায়েদার শাখা।

এরপর আল কায়েদার নতুন লক্ষ্য হল তাদের কার্যক্রমের প্রসার, ইরাক এবং অন্যান্য দেশ যেখানে তারা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে নিয়মিত আপডেট নেওয়া এবং তাদের মূলনীতিকে স্থানীয় স্কেল (আফগানিস্তান) থেকে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেওয়া যাতে তারা আরও শাখা গঠন গঠন করতে পারে। তাই যদি আফগানিস্তানের পক্ষে আমেরিকার নেতৃত্বে সংঘটিত যুদ্ধ থেকে কখনও রিকভার করা সম্ভব না হয়, তাদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জিহাদের মূলনীতিটি অন্যান্য দেশে চলতে থাকবে। আল কায়েদা আন্তর্জাতিকভাবে ছড়িয়ে পরায় অনেক সুবিধা আছে : প্রভাব আর নিরাপত্তার জন্য অনেক এলাকা পাওয়া যাবে, এতে আমেরিকার পক্ষে প্রত্যেক দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কঠিন হয়ে পড়বে যেখানে তারা ঘাঁটি গেড়েছে। এটা করার জন্য আল কায়েদা 'র

দরকার তাদের লক্ষ্য -উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য নতুন সদস্য তৈরি ও লুকানোর জায়গা খুজার জন্য আরও অনেক স্থানে চলে যাওয়া। এর ফলে তারা প্রয়োজনীয়তা ও সঠিক সময় বুঝে জিহাদ শুরু করতে পারবে যেখান থেকে আর যখন থেকে খুশি।

সেল টেকনিক

আল কায়েদার সিকিউরিটি জোরদার করার জন্য আবু মুস'আব আল-সুরী (আল কায়েদার স্ট্রেটেজিস্ট, তার লিখিত বই : The global Islamic resistance call এ তুলে ধরেছেন) ছোট ছোট সেল এর আইডিয়া তুলে ধরেছেন, যেখানে প্রত্যেক সেলে ৫ জন করে লোক থাকবে। এই সেলের সদস্যরা এমন এক আল কায়েদা মেম্বারের মাধ্যমে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ লাভ করবে, যার থাকবে একটি গোপন আইডেন্টিটি এবং কোন নির্দিষ্ট সাইন ব্যাবহার করবেন (যেমন ভিডিওতে দেখা ওসামা 'র চোখের পলক ফেলার নির্দিষ্ট ধরণ অথবা নির্দিষ্ট কোন বডি মুভমেন্ট) তাদের দেওয়া মিশন কমপ্লিট করতে তাদেরকে "জাগ্রত" করার জন্য। যখন সদস্যরা সচল থাকবে না তখন তাদের বলা হবে "ঘুমন্ত সেল"। তারা তাদের প্রশিক্ষকের সত্যিকারের পরিচয় সম্পর্কে জানবেনা, তাই যদিও কখনও ওই "ঘুমন্ত সেল" এর মেম্বাররা ধরা পড়ে তবে তারা বলতে সক্ষম হবে না আসলে কোন মানুষটি তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলো।

আল কায়েদা এই টেকনিক শিখতে পেড়েছিল আফগানিস্তানে (আমেরিকার প্রাথমিক হামলার সময়)তাদের পুরো দলটা প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি হতে যাচ্ছিলো এমন এক কঠিন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার পর, যখন আমেরিকান ফোর্স আল কায়েদা সদস্যদের গুহাগুলোতে আক্রমণ করে কিছু ডকুমেন্ট পেয়েছিলো যেগুলোতে আল কায়েদা সদস্যদের নাম ও তাদের বিস্তারিত প্রোফাইল লেখা ছিল। কিছু স্বতন্ত্র সেল, যাদের একে অপরের সাথে কোন কানেকশন থাকবে না (মতাদর্শ ও সাধারণ উদ্দেশ্য ছাড়া), তৈরি করা আল কায়েদার মতাদর্শের সারভাইবাল ও নেতাকে কোন বিপদজনক অবস্থায় না ফেলে দীর্ঘ মেয়াদি লক্ষ্য নিশ্চিত করে, এমনকি যদিও মেম্বারদের কাউকে আটক বা হত্যা করলেও মতাদর্শের বা লক্ষ্য নিরাপদ থাকবে।

এই নতুন কৌশলের বিপরীতে আমেরিকা "স্টিং অপারেশন" নামের নতুন এক প্রতারনার পদক্ষেপ নিল যার সাহায্যে তারা জিহাদে অনুপ্রাণিত মুসলিম যুবকদের কাছে মিথ্যা পরিচয়ে প্রশিক্ষক পাঠিয়ে তাদেরকে বিশদভাবে প্রশিক্ষণ দিবে এবং কোথায় অ্যাটাক করতে হবে তা বলে দিবে। যখন সেই মুসলিম যুবক সেই স্থানে অ্যাটাক করবে তখন বোমা বিস্ফোরিত হবে না (পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী) এবং তাকে সেই চক্রান্তকারী হিসেবে আটক করে সন্ত্রাসী হিসেবে জেল খাটানো হবে। এথেকে যা বুঝা যায় তা হল ওই মিথ্যা প্রশিক্ষক ছিল একজন গোয়েন্দা এবং FBI অথবা CIA এজেন্ট।

করাচীতে আল কায়েদার জন্য দুঃসংবাদ

যেহেতু আল কায়েদা সদস্যরা তাদের আইডিয়া পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ফোন ও ইন্টারনেট ব্যাবহার করতেন, আমেরিকান Echelon * তাদেরক কার্যক্রম ট্র্যাক করতে এবং তাদের অনেককেই আটক করতে সক্ষম হয়। আটককৃতদের এখন অনেকে এখন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা কুখ্যাত জেলগুলোর মধ্যে যেমন গুয়ান্তানামো বে, বাঘরাম, পূর্ব ইউরোপ ,মরক্কো, আলজেরিয়া, জর্ডানের কুখ্যাত জেলগুলোর মধ্যে নির্যাতিত হচ্ছে।

* Echelon   হল মাল্টি মিলিয়ন টেরাবাইট বিশিষ্ট কম্পিউটার সিস্টেম যা সারা বিশ্বের সব ফোন কল আর ইন্টারনেট এক্টিভিটি রেকর্ড করার কাজে CIA আর মোসাদ (ইসরাইলের গোপন গোয়েন্দা সংস্থা) ব্যাবহার করে।

যদিও অনেক আল কায়েদা সদস্যদের আটক করে তাদেরকে গুয়ান্তানামো বে'র মতো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা কুখ্যাত জেলগুলোর মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আল কায়েদার হাতে তখনও তিনটি অপশন ছিল :

(১) করাচিতে থেকে যাওয়া : কারন এখানে যোগাযোগ করার আর রিসার্চ করার সুবিধা আছে, কিন্তু বড় সমস্যা হল পাকিস্তান সরকার আটক করে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়ার আশঙ্কা থাকে।

(২) গোত্রীয় এলাকাগুলোতে চলে যাওয়া :গোত্রীয় লোকগুলোর পক্ষ থেকে আশ্রয় লাভে করা যাবে কিন্তু যোগাযোগের মাধ্যম খুবই দুর্বল।

(৩) অন্য কোন দেশে চলে যাওয়া : যোগাযোগের থেকে নিরাপত্তাকে গুরুত্ত দিয়ে বেশিরভাগই দ্বিতীয় অপশন গ্রহণ করলেন। অন্যান্যরা করাচী ছেড়ে বিভিন্ন দেশে চলে গেলেন নতুন সেল তৈরি করার জন্য। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই আল কায়েদার সেল আছে।

ইরাক, ২০০২

৯০ এর পরবর্তীতে কিছু আল কায়েদা মেম্বার তোরা বোরা পাহাড় থেকে পাকিস্তান, ইরান এবং এরপর ইরাক গেলেন। তাই সাদ্দামের শাসনকালেও (২০০০ সালের আগ পর্যন্ত) ইরাকে আল কায়েদার উপস্থিতি ছিল তবে তারা সংখ্যায় ছিল খুব কম।

২০০০ সালের আগের বছরগুলোতে ইরাক সরকার আল কায়েদাকে ইরাকে আশ্রয় গ্রহনের অনুমতি দিল এই শর্তে যে কখন কোন ছোট মিশনের প্রয়োজন পড়বে তখন তারা সেটা সম্পূর্ণ করবে একত্রিত ভাবে এবং একদল

অপরকে যুদ্ধক্ষেত্রে "ব্যাবহার" করবে না (যা প্রক্সি যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত)। উভয় দলই এতে তাদের নিজেদের সারভাইভালের জন্য উপকৃত হবে।

আমেরিকা একযোগে আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণ (২০০১-০২) করার মাধ্যমে তাদের সময় ও অর্থ অপচয় করলো ইসলামিক অভ্যুত্থানকে পরাজিত করার জন্য – যা ভবিষ্যতে আমেরিকার অর্থনৈতিক অস্তিত্বের ক্ষেত্রে প্রচুর ক্ষতি করবে।*

আমেরিকা ইরাকে প্রবেশ করে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সাদ্দামকে (তিনি প্রকৃতপক্ষে তার কিছু কাছের মানুষ দিয়ে প্রতারিত হয়েছিলেন) ক্ষমতা থেকে সরিয়ে পুরো ইরাকের উপর কতৃত্ব স্থাপন করলো।

সাদ্দামের লোকেরা, যারা সাদ্দামকে আটক হতে দেখেছিল তারা AQI (আল কায়েদা ইন ইরাক) এর সাথে যোগ দিলেন। কারন তারা চিন্তা করলেন যে ওই মুহূর্তে তাদের অন্য কিছু করার নেই এবং তারা ইরাকের নতুন শিয়া সরকার কতৃক প্রতিশোধমূলক আক্রমনের শিকার হতে পারেন। একমাত্র এটা করাটাই তাদের জন্য নিরাপদ ছিল। ফলে ইরাকের আল কায়েদার সদস্য সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেল এবং তাদের দক্ষতা আরও দৃঢ় হল । এর ফলে আল কায়েদা ইন ইরাক আরও উন্নত, আরও সুদক্ষ এবং সুগঠিত সংঘটনে পরিনত হল ।

শিয়া,কুরদি আর সুন্নিদের লুটপাটের কারনে ইরাকে আরও একবার বিশৃঙ্খলা দেখা গেল, যারা ক্ষমতার পিছে অন্ধ হয়ে ছুটছিল। এটা ছিল এক উত্তেজনাময় অবস্থা। এসময় আল কায়েদা ইন ইরাক গরিলা ফোর্স হিসেবে আবির্ভূত হল যারা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল যেন আমেরিকা ইরাকের সম্পদ (যেমন তেল,গ্যাস ইত্যাদি) হাতিয়ে নিতে এবং আরেকটি দালাল সরকার বসিয়ে দিতে না পারে।

সব আল কায়েদা গ্রুপের লক্ষ্য হল সুন্নি মুসলিম দেশগুলোতে অস্থায়ীভাবে থাকা যাতে দালাল সরকাররা তাদের জনগনের উপর নির্যাতনের মাধ্যমে কর্তৃত্ব করতে এবং অন্যান্য দেশের কাছে মুসলিমদের সম্পদগুলো নামমাত্র মুল্যে বেঁচে দিতে না পারে। এই অস্থায়ীত্বভাবে থাকার কারনে তাদের উদ্দেশ্য জানার পর তাদের সাথে নতুন সুন্নি মুসলিমরা যোগ হবে এবং এর কারনে দালাল সরকার ও তাদের সৈন্যের ভিতর ভয় প্রবেশ করতে থাবে,যারা কিনা আল কায়েদার ওইসব সদস্যকে গ্রেপ্তার করতে চায়।

আল কায়েদার মতো মুজাহিদ গ্রুপগুলো দেশের অর্থনীতি থামিয়ে দিতে দেশের স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে Sabotage techniques ব্যাবহার করতে পারে অথবা লোকাল/ ন্যাশনাল সার্ভিস দুর্বল করতে Terror techniques (যেমন ইসলাম বিরোধী বিচারক হত্যা করা, পুলিশ স্টেশন, হাইরোড অথবা তেলের পাইপলাইন ইত্যাদির ক্ষতি করা) অবলম্বন করতে পারে যাতে সরকারের সার্ভিস আর অর্থনীতি ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং অস্থিরতা বিরাজ করে।

এই অস্থিরতা সরকারকে সবসময় ভয়ের মধ্যে রাখবে এবং যখন সঠিক সময় আসবে তখন আল কায়েদা সে দেশের আংশিক বা পুরোটা দখল করে নিবে এবং মুসলিমদের সম্পদকে ইসলামিক শারিয়া অনুসারে ব্যাবহার ও বণ্টন করবে।

আল কায়েদার এই অস্থায়িত্বের কারনে নিরীহ মানুষ ও সম্পদের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। (আধুনিক যুদ্ধাবস্থার একটি অংশ হল যে উভয় পক্ষের মধ্যে গুলিবিনিময়ের সময় নিরীহ লোকদের গ্রেপ্তার করা বাধ্যতামূলক, কারন প্রাচীনকালের যুদ্ধের তুলনায় আধুনিক যুগের যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক অস্পষ্টতা দেখা যায়)। আল কায়েদার লক্ষ্য নিরীহ বেসামরিক লোকদের কোন ক্ষতি করা এড়িয়ে চলা, কিন্তু কখনও কখনও হাই প্রোফাইলের কোন ব্যক্তি টার্গেট করার মতো কোন বড় লক্ষ্য থাকলে অনিবার্য হয়ে পড়ে। অবশ্য পরবর্তী বছরগুলোতে তারা মানুষের মন জয় করার জন্য পাব্লিক এলাকাগুলোতে বিস্ফোরণ না করার পদক্ষেপ নেয়, এমনকি হাই প্রোফাইলের টার্গেট হত্যা করার জন্য যদি দেরি করতে হউ তবুও। একারনেই ইরাকের তুলনায় সিরিয়াতে তুলনামুলকভাবে আত্মঘাতী হামলা কম ঘোটতে দেখা যায়।

<u>ইরাক যুদ্ধে প্রাথমিক সফলতা (২০০২-২০০৬)</u>

ইরাক যুদ্ধের প্রথম বছরগুলোতে আল কায়েদা মার্কিনীদের বিপক্ষে সফলতা অর্জন করে, তারা শত্রুর পরিবহন আঘাত করার জন্য ইম্প্রভাইসড এক্সপ্লসিভ ডিভাইস (IED) ব্যাবহার করেন, যা আত্মঘাতী হামলার সময় ব্যাবহার করা হয়। (মুজাহিদ তার শরীরের সাথে বোমা ফিট করে শত্রুর এলাকাতে চলে যান এবং বোমাটি বিস্ফোরিত করেন, এতে শত্রুরা মারা যায় এবং তিনি শহিদ হন)। এক্ষেত্রে আল কায়েদার দলীল হল সূরা বুরুজ এবং সহিহ মুসলিমে বর্ণিত সেই বালক আর রাজার ঘটনা, যেখানে বালকটি তার দ্বীনের স্বার্থে নিজেকে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। এরপর ঘটনাক্রমে অন্যান্য লোকেরা যারা এটা দেখে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো তারা দ্বীনের স্বার্থে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হল। আল্লাহ্ কুরআনে (৮৫ : ১১) বলেছেন তারা "মহা সাফল্য" অর্জন করেছে। আক্রমণ করার এই সফল পদ্ধতি আফগানিস্তানে নতুন প্রজন্মের তালিবান ও আল কায়েদার জন্য এক্সপোর্ট করা হয়েছিলো।

ইরাক যুদ্ধের প্রথম ভাগে আল কায়েদা প্রচুর সফলতা অর্জন করেছিলো মার্কিনীদের ক্ষতি করার মাধ্যমে এবং মার্কিন সৈন্যদের অনেকেই মানসিকভাবে ব্যধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল (যুদ্ধাভিযানে মানসিকভাবে ভয় পাওয়ার একটা অংশ) আবু মুস'আব আল জারকাওই এর শত্রুর শিরচ্ছেদের একটি ভিডিও দেখে যা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

ইরাক যুদ্ধে আল কায়েদার ৩ টি বড় ভুল

২০০৬ সালের পরে অবস্থা পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে যায় আল কায়েদার ৩ টি বড় ধরনের ভুলের কারনে যা থেকে ভবিষ্যতে আল কায়েদা গ্রুপগুলো শিক্ষা লাভ করতে পারবে এবং ভুলের পুনরাবৃত্তি না হওয়ার জন্য লক্ষ্য রাখবে।

(১) তারা সেখানকার জনগনের মন জয় না করেই তাদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন। এর মধ্যে একটি হল মহিলাদেরকে ইসলামিক নিয়ম অনুযায়ী কাপড় (জিলবাব) পড়ানোর জন্য তারা তাদেরকে জোর করেছিলেন, যাতে লোকেরা তা না পড়ার কারনে তাদের দিকে খারাপ দৃষ্টিতে না তাকায়।

(২) যেসব গোত্রীয় নেতা আমেরিকান সৈন্যদের সাহায্য করেছিলো তাদের হত্যা করা, এর ফলে ওই গোত্রের লোকেরা আল কায়েদাকে ঘৃণা করতে শুরু করলো এবং তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিল

(৩) আল কায়েদা ইন ইরাকের সব মেম্বার ইরাকি ছিল না বরং সৌদি আরবের কিছু মুসলিম ছিল যারা আল কায়েদাতে যোগ দিয়েছিলো, আল কায়েদার এই সৌদি মেম্বারদের দেখে অনেক লোক মনে করলো এটি নিশ্চয়ই কোন চক্রান্ত (তারা মনে করেছিলো সৌদি আরব জাতীগত কোন উদ্দেশ্যে ইরাকে আক্রমণের জন্য মানুষ পাঠাচ্ছে এবং তারা এটাকে ঢেকে রাখার জন্য ধর্মীয় শ্লোগান ব্যাবহার করছে)।

এই তিনটি পয়েন্ট পরিস্থিতি পুরোপুরি পরিবর্তন করে দিল এবং যেসব গোত্র আল কায়ের সমর্থক ছিল তারা আল কায়েদার বিপক্ষে চলে গেল।

ফলাফল : জাগরণ পরিষদ এবং "ইরাকের সন্তানেরা"

আমেরিকা নতুন কৌশল অবলম্বন করলো। তারা প্রতিটি গোত্রের প্রতিটি লোকের পিছনে মাসিক ৩০০ ডলার ব্যয় করলো আল কায়েদা ইন ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। এতে আল কায়েদা ইন ইরাকের সাথে থাকা (২০০২-২০০৬) হাজার লোকেরা হঠাৎ তাদের দিক পরিবর্তন করে ফেলল। তাদেরকে জাগরণ পরিষদ বা ইরাকের সন্তান হিসেবে ডাকা হত। আচমকা মোড় ঘুরান এই দলটি (এতে অনেক সুন্নি মুসলিমও ছিল) তাদের এই কাজের মাধ্যমে আল কায়েদা ইরাকে যেসব সফলতা অর্জন করেছিলো তার সবই ভেঙে চুরমার করে দিল।

এরপর নূর মালিকির শিয়া সরকার আমেরিকা সরকারের সাহায্য নিয়ে সেখনাকার সংখ্যালঘু সুন্নিদের উপর নির্যাতন করা শুরু করে দিল এবং তা আজ পর্যন্ত চলছে। যেসব সুন্নি আল কায়েদা ইন ইরাক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল তারা তাদের সেই ভুলের জন্য চরমভাবে অনুতপ্ত বোধ করলো।

এই ঘটনা যেন ইরাকে ঘটা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। যারা ইরাকি জনগণকে সাহায্য করতে চায়, দুঃখজনকভাবে তাদের সাথেই ইরাকি জনগণ বিশ্বাসঘাতকতা করে। এই শিক্ষা পাওয়া যায় ইসলাম পূর্বক পার্সিয়ান সাসানিক রাজ্য, আলী (রা.) এবং কারবালায় হুসাইন (রা.) এর সাথে সংঘটিত ঘটনা থেকে, এবং তারা পরবর্তীতে আল কায়েদার সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করে, যদিও পরবর্তীতে তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়েছিলো।

এই সময়টাতে (২০১২) ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক (ISI, আল কায়েদার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত) মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার করার পর সেখানকার শিয়া সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। তাদের লক্ষ্য হল সরকারকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য অন্তর্ঘাত করা এবং যুদ্ধে চুক্তিকারী ভাড়াটে সৈন্যদের টার্গেট করা (যাদেরকে দেশের পরিবর্তে অসৎ কিছু ধনী ব্যবসায়ীদের জন্য যুদ্ধে লড়বার উদ্দেশ্যে ভাড়া করা হয়)

অধ্যায় ৫ – নতুন বন্ধু (২০০৫-২০১২)

<u>আল কায়েদার নতুন বন্ধু : পাকিস্তানি তালিবান (২০০২-২০০৬ +)</u>

হাকিমুল্লাহ মেহসুদ

ওসামা এবং তার সাথীরা পাকিস্তানে প্রবেশ করার পর আল কায়েদার মতাদর্শ প্রচারের জন্য অনেককে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

আমেরিকা ওসামা আর সাথীদের পাকিস্তানে প্রবেশের ব্যাপারে এবার পুরোপুরি সচেতন ছিল। এরপর তারা দুটি টার্গেট ঠিক করলো – আফগানিস্তানের পাহাড়ে তালিবান নেতৃত্ব এবং পাকিস্তান বর্ডারে আল কায়েদা নেতৃত্ব।

আমেরিকা নতুন এক টেকনলজি ব্যাবহার করা শুরু করলো –প্রিডেটর ড্রোন, এটি একটি রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মানববিহীন বিমান, যা আমেরিকা থেকে নিয়ন্ত্রন করা হয়, এটি গুপ্তচর হিসেবে ব্যাবহার করা যায় এবং নির্দিষ্ট কোন টার্গেটে মিসাইল নিক্ষেপ করতে পারে।

আমেরিকা পাকিস্তান বর্ডারের উপর এরপর থেকে ড্রোন পরিচালনা করত এবং বর্ডারে অবস্থিত আল কায়েদা নেতাদের টার্গেট করত। আল কায়েদার সব মেম্বারদের এক জায়গায় অবস্থান করার বিপদ জেনে শুধুমাত্র কিছু মেম্বার বর্ডার এলেকাতে থেকে গেলেন। এই থেকে যাওয়া আল কায়েদা সদস্যরা স্থানীয় গোত্রগুলোর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন এবং তাদের মতাদর্শ প্রচার করলেন, তারা তাদের সমর্থকদের সাথে গরিলা যুদ্ধকৌশল ও টেকনলজি আইডিয়া শেয়ার করলেন। আল কায়েদার এই নতুন সমর্থকরা পরবর্তীতে TTP (তেহরাক ই তালিবান পাকিস্তান, সংক্ষেপে টি টি পি) নামে পরিচিত হয়। মেহসুদ গোত্রের লোকেরা নেতা হিসেবে নির্বাচিত হয় – আবদুল্লাহ মেহসুদ,বাইতুল্লাহ মেহসুদ এবং বর্তমান নেতা (এই বইটি লিখার সময় পর্যন্ত - ২০১২) হাকিমুল্লাহ মেহসুদ – এক সাহসী যুবক। মেহসুদদের সাথে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ৮০ ‘র দশকে জিহাদের সময় থেকেই আল কায়েদা ও তালিবানদের ভাল সম্পর্ক ছিল।

বন্ধুত্ব বিস্তৃতি আর শক্তি বৃদ্ধির লক্ষে তারা স্থানীয় গোত্রগুলোর সাথে একত্রে কাজ করলেন।

আল কায়েদার জন্য এরা পাকিস্তানে অনেক বড় সাপোর্ট হল। আল কায়েদা বুঝতে পারছিল যদি আফগানিস্তানের তালিবানরা কখনও হারের মুখোমুখি হয় এবং আমেরিকার সাথে শান্তিচুক্তির দিকে ঝুকে পড়ে তখন আল কায়েদার হাতে পাকিস্তানের তালিবান থাকার কারনে তারা তাদেরকে এবং তাদের মতাদর্শকে রক্ষা করতে পারবে।

পাকিস্তানের বর্ডারে তীব্র ড্রোন হামলার সময়টাতে এমন এক স্থানে আত্মগোপন করেছিলেন যে দুই- একজন ছাড়া কোন মানুষ জানত না তিনি কোথায় আছেন। ওসামা সেখন থেকেই নির্ভরযোগ্য সদস্যদের মাধ্যমে চিঠি দিয়ে আল কায়েদার বাকি সদস্যদের কাছে তার ম্যাসেজ পাঠাতেন। তার অবস্থান যাতে সনাক্ত করা না যায় সে জন্য তিনি ফোন বা ইন্টারনেট ব্যাবহার করতেন না। তার সেই থাকার স্থান ছিল পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদ, এটি একটি শান্ত ও মধ্যবিত্তদের শহর, কেউ মনে করতে পারবে না যে এখানেই একজন আদর্শিক বড় নেতা রয়েছেন। তিনি আফগানিস্তানের গুহা থেকে দ্রুত তার স্ত্রী ছেলে-মেয়ে ও নাতিনাতনি সহ চলে গিয়েছিলেন ৩-4 তলার এক বিল্ডিংয়ে।

পাক – আমেরিকা মৈত্রীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ

পাকিস্তানের সাথে আমেরিকার মজবুত মৈত্রীত্ব স্থাপন হল। আমেরিকা পাকিস্তান আর্মিকে তীব্রভাবে চাপ দিতে থাকল পাকিস্তান আর আফগানিস্তানে থাকা তালিবানকে আক্রমণ করতে।

১৯৯০ এর দিকে পাকিস্তান আফগানিস্তানের তালিবানকে অ্যাটাক করার ব্যাপারটি পছন্দ করত না এবং আফগান আর বর্ডারের গোত্রীয় লোকেরাও পাকিস্তানে অ্যাটাক করা পছন্দ করত না। উভয় পক্ষই একে অপরকে নিরাপদ এলাকা হিসেবে ব্যাবহার করত কারন উভয়ই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভুমি ছিল এবং পাকিস্তান এ থেকে নিরাপত্তা বোধ করত এবং তাদের আসল ফোকাস ছিল ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিরোধে সব রকমের ও সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। আফগান তালিবানরা পাকিস্তানের মতো একটি প্রতিবেশী পেয়ে খুশী হয়েছিলো।

কিন্তু ৯/১১ এর পর আমেরিকা পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য (যাকে ঘুষ বলা হয়) ও চাপ দিয়েছিলো বর্ডারে আশ্রয় নেওয়া আল কায়েদার মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। এটা করার ব্যাপারে পাকিস্তান মোটেও খুশী ছিল না এবং তারা ছোটখাটো কিছু অ্যাটাক মঞ্চায়িত করেছিলো যাতে তারা আমেরিকাকে বলতে পারে তারা এই ব্যাপারে কিছুটা সফল হয়েছে। অনেক সময়ই পাকিস্তানি আর্মি বর্ডারের গোত্রগুলোকে হামলার আগে বন্ধুত্বমূলক পূর্বাভাস দিত যে তারা কোন কোন স্থানে হামলা মঞ্চায়িত করতে যাচ্ছে, যাতে গোত্রগুলো আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু আমেরিকার সাথে পাকিস্তানের এই প্রতারনার কথা জানার পর আমেরিকা পাকিস্তানের উপর আরও তীব্র চাপ দিতে থাকে এবং ওই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে ফাটল ধরে।

আমেরিকা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পিছনে আরও অর্থ খরচ করলো এবং তাদেরকে একদিকে অর্থের প্রলোভন দিল আর অন্যদিকে যুদ্ধের ভয় দেখালো। পারভেজ কায়ানি (চরম উগ্র এবং আমেরিকাপন্থী) জেনারেল হিসেবে আসার পর যখন সে আর্মি কম্যান্ডের কন্ট্রোল হাতে পেল,তখন থেকে তালিবানের সাথে পাকিস্তানি আর্মির সম্পর্ক খারাপ হতে লাগলো। সে গোত্রীয় এলাকাগুলোতে নিরীহ লোকদের হত্যা করতে লাগলো এবং এতে অবশ্য আল কায়েদার সাথে গোত্রগুলোর একতা আরও দৃঢ় হল। এটি সেই সময়ে ঘটনা যখন অনেক আল কায়েদা মেম্বাররা করাচীতে আটক হয়েছিলো এবং তাদেরকে পাকিস্তান, বাগ্রাম,গুয়ান্তানামো বে'র মতো গোপন টর্চার সেলগুলোতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, যেখানে তাদেরকে বিভিন্ন উপায়ে টর্চার করা হয়েছিলো (ছাদে ঝুলিয়ে রাখা, চাবুক মারা, ছুরি দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ –প্রত্যঙ্গ কাটা, মানসিক টর্চার, পরিবারের সদস্যদের ধর্ষণ ও হত্যার ভয় দেখানো ইত্যাদি)।

এর ফলে আল কায়েদা এবং গোত্রগুলোর (পাক-আফগান তালিবান) মধ্যে পাকিস্তানের প্রতি ঘৃণা আরও বেড়ে গেল। কিন্তু এই ব্যাপারে তালিবানরা পাক-আমেরিকা মিত্রবাহিনীকে আক্রমণ করতে ভয় পেল যে তারা মুসলিম আর্মিকে হত্যা করতে যাচ্ছে।

আল কায়েদা তাদেরকে এ ব্যাপারটি পরিষ্কার করার জন্য কুরআনের এই আয়াতটি মনে করিয়ে দিলেন :

“ হে ইমানদারগণ, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের তোমরা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কর না, তারা একে অপরের বিন্ধু, এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদের কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কর তবে সেও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৫১)

আল কায়েদা এই আয়াতকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে এটা প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে আমারিকান খ্রিস্টান আর ন্যাটো বাহিনীকে (যারা প্রধানত খ্রিস্টান এবং প্রায়ই জায়নিস্ট ইহুদিদের আদেশ ও দিকনির্দেশনায় তাদের দিয়ে যুদ্ধ পরিচালিত হয়)। এছাড়া তারা এমন কিছু মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলো যারা ইসলামিক শারিয়াহকে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিল – এটা সবচেয়ে জঘন্যতম অপরাধ।

কিন্তু তালিবানরা এই ব্যাপারে এরপরও সন্দেহে ছিলেন যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে এই পাকিস্তান আর্মি তাদের দ্বীনকে কৌতুক হিসেবে নিয়েছিল এবং বিভিন্ন নিকৃষ্ট উপায়ে তাদের ভাইদেরকে জেলে নির্যাতন করছিলো।

আবু মারওয়ান আল-সুরি ছিলেন এক আফগান-আরব। একবার তাকে বাস চেকপয়েন্টে থামান হল। যে তাকে থামিয়েছিলো সে একজন আফগান আর্মি পেট্রোল ছিল। তিনি তার অস্ত্র উঁচু করে বললেন যে তিনি একজন মুজাহিদ। তারা তাকে ছেড়ে দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসলো এবং তাকে গ্রেপ্তারের জন্য প্রস্তুত হল, কিন্তু তিনি গুলি করেননি এই ভয়ে যে তারা মুসলিম এবং এজন্য তাকে বিচার দিবসে আল্লাহ’র কাছে জবাব দিতে হবে। তারা তাকে ধাওয়া করলো এবং পিছন থেকে গুলি করে হত্যা করলো। পশ্চিমা সৈন্যরা এতে খুশী হয়ে তাদের মেডেল দিয়ে পুরস্কৃত করলো। এই ঘটনার পর স্থানীয় লোকেরা প্রচণ্ড রকম রেগে গেল এবং তারা ওই এলাকার সব আর্মি পেট্রোল ও আর্মি ব্যাকআপ ধ্বংস করে দিল।

সাদিক নামের আরেকজন মুজাহিদ, যিনি অধিকৃত কাশ্মীরের জন্য পাকিস্তানি আর্মিকে সাহায্য করার জন্য একত্রে যুদ্ধ করেছিলেন,কিন্তু যখন তিনি আফগান তালিবানদের সাহায্য করার জন্য আফগানিস্তানে হিজরত করে যেতে চাইলেন তখন পাকিস্তানি ISI (গোপন গোয়েন্দা সংস্থা) তাকে গ্রপ্তার করলো। তারা তার এক হাত বেঁধে ঝুলিয়ে রাখল এবং ছুরি দিয়ে তার পায়ে তারকা চিহ্ন খোদাই করে দিল। তিনি বুঝতে পারলেন যে প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানি আর্মি ইসলামের শত্রু যারা কাশ্মীরের মুজাহিদদেরকে দ্বীনের (ইসলামের) কারনে নয় বরং অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যাবহার করেছিলো। জেলে থাকার সময় তিনি এদের চরম নির্যাতন ও প্রকৃত চেহারা (বিশেষ করে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এদের আচরণ) দেখেছিলেন, তাই তিনি জেল থেকে বের হয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে চেয়েছিলেন।

এই ঘটনাগুলো তালিবান সদস্যদের গোত্রীয় যোদ্ধা থেকে আল কায়েদার ভাবাদর্শীতে পরিনত করে এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কাছে নিজেদের সম্পৃক্ত করে। আমেরিকার সাথে পাকিস্তানের এই পাশবিক মৈত্রীত্ব তালিবান যোদ্ধাদের একটি নতুন জেনারেশন তৈরী করে যারা কিনা আমেরিকা ও তার বন্ধুদের আরও তীব্র বিরোধিতা

করে, ভবিষ্যতে যেকোন শান্তি চুক্তির সম্ভাবনা প্রত্যাখ্যান করে এবং পাকিস্তান সরকারকে চাপ দেয় গোত্রীয় যুদ্ধের পরিবর্তে জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে আমেরিকার স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই করতে।

আল কায়েদা এবং তালিবানের পরবর্তী প্রজন্ম

ওসামা বিন লাদেন এবং আবদুল্লাহ আযযাম কতৃক তোরা বোরা পাহাড়ে (১৯৮০-২০০৪) গঠিত প্রাথমিক আল কায়েদা মধ্যবিত্ত আরব ও মুসলিম নিয়ে গঠন করা হয়েছিলো যারা প্রধানত ইঞ্জিনিয়ারিং,মেডিসিন, ইকনমিক্স ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লেখাপড়া করতেন। তারা ছিলেন শিক্ষিত এবং সুন্দর ভবিষ্যতের আশা করতেন। কিন্তু তারা এর থেকে বড় কোন লক্ষে অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল কায়েদায় যোগ দিয়েছিলেন।

আল কায়েদা ও তালিবানের নতুন প্রজন্মও (২০০৫-২০১২ +) মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের যুবক। কিন্তু তারা পূর্ববর্তী প্রজন্মের তুলনায় আরও বেশী বিপদজনক ও টেকনলজিক্যালী এগিয়ে।

পুরনো এবং নতুন প্রজন্ম এর তুলনা

(১) পুরনো প্রজন্মের তালিবানরা প্রায়ই পাকিস্তানি আর্মির সাথে বন্ধুভাবাপন্ন আচরণ করত এটা মনে করে যে তারা মুসলিম এবং তাদের কোন ক্ষতি করবে না। (কারন রাশিয়ার বিরদ্ধে জিহাদের সময় পাকিস্তানি সরকার আফগান তালিবানদের সাহায্য করেছিলো)।

নতুন প্রজন্মের তালিবানরা পাকিস্তানি এবং পশ্চিমা আর্মির নিষ্ঠুরতা দেখছে এবং বুঝতে পেড়েছিল তাদের বিশ্বস্ততার ব্যাপারে। এটি পুর্ববর্তী প্রজন্মের তুলনায় তাদের আরও বেশী চরমপন্থী করলো।

(২) নতুন প্রজন্মের তালিবানরদের পুরনো প্রজন্মের তালিবানদের তুলনায় আল কায়েদার মতাদর্শ আরও বেশী করে দেখা যায়। পুরনো প্রজন্মের তালিবানদের উদ্দেশ্য ছিল একটি ন্যাশনাল এজেন্ডা (স্থানীয় গোত্রগুলো নিয়ে), কিন্তু নতুন প্রজন্মের তালিবানদের এজেন্ডা হল গ্লোবাল কারন তারা জাতীয় বা গোত্রীয় পরিচয়ের থেকে মুসলিম পরিচয়কেই প্রাধান্য দেয়, যদিও এটার জন্য তাদের গোত্রের নেতার কথা বিপরীতে যেতে হয়। আল কায়েদার জন্য এটি কয়েক ধাপ এগিয়ে জাওয়া যাদের শতভাগ অনুগত কমান্ডার দরকার।

(৩) টেকনলজিক্যাল স্কিলের উন্নতিসাধন: পুরনো প্রজন্মের তালিবানের তুলনায় নতুন প্রজন্ম বাস্তবধর্মী প্রযুক্তির ব্যাপারে আরও উন্মুক্ত, এটা প্রধানত এজন্য যে এখন ইন্টারনেট ও অবাধ তথ্যের যুগ।

আল কায়েদার সাথে তারা মেশার কারনে স্পষ্টভাবেই তাদের মধ্যে গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হতে দেখা যায়, এই যেমন পুরনো প্রজন্মের তালিবানের তুলনায় নতুন প্রজন্মের তালিবানের মধ্যে আত্মঘাতী হামলা অনেক বেশী হতে দেখা যায়, যা কিনা পুরনদের কাছে অকল্পনীয় ছিল।

সারমর্ম হিসেবে বলা যায়, নতুন প্রজন্মের তালিবান এবং আল কায়েদা আরও সাহসী, পুরো বিশ্বে সংখ্যায় আরও অনেক বড়, প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী, আদর্শিকভাবে আরও বেশী দুর্দমনীয় হয়েছে এবং বর্তমানে তাদের একটি আন্তর্জাতিক এজেন্ডা আছে – সেটা হল জায়নিস্টদের কাছ থেকে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করা এবং খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করা।

এসব কিছু বাস্তবায়ন করা থেকে তাদের রোধ করা যেত শুধু একটা বক্তব্য দিয়ে –ওসামাকে দেখা মাত্রই বিমান হামলা চলবে (৯/১১ এর পূর্বে)। কিন্তু লোভ যেন কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে পেয়ে বসল, আর আজ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সেই ভুলের মাশুল দেওয়া প্রায় অসম্ভব যার ফলাফল হল আজকের ক্রমবর্ধমান ট্রিলিয়ন ডলার ঋণ।

পুরনো প্রজন্ম এবং নতুন প্রজন্মের তালিবান কমান্ডার

পুরনো প্রজন্ম

গড় বয়স : ৩৫

ভাষা : পশতু, দারি, উর্দু, সামান্য আরবী

দক্ষতা : চাষাবাদ, গেরিলা যুদ্ধের পুরনো কৌশল

লক্ষ্য : আফগানিস্তানকে দখলদারিত্ব থেকে রক্ষা করে একটি ইসলামিক ইমারত প্রতিষ্ঠা করা।

আনুগত্য : মোল্লা ওমর (আফগানিস্তানে ইসলামিক ইমারত প্রতিষ্ঠার জন্য) এবং গোত্রের প্রতি (সমর্থনের জন্য)

নতুন প্রজন্ম

গড় বয়স : ২৫

ভাষা : আরবী, ইংরেজী, উর্দু, পোশতু , দারি

দক্ষতা : গেরিলা যুদ্ধের আধুনিক যুদ্ধ কৌশল, অস্ত্র সম্পর্কে আরও অভিজ্ঞ এবং বোমা তৈরিতে সক্ষম।

লক্ষ্য : একটি আন্তর্জাতিক এজেন্ডা, প্রথমে আফগানিস্তান মুক্ত করা এবং জায়নিস্টদের কাছ থেকে জেরুজালেম মুক্ত করে বিশ্বব্যাপী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত করার আগ পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাওয়া।

আনুগত্য : মোল্লা ওমর ও আল কায়েদার মতাদর্শের প্রতি।

আফগানিস্তানে আমেরিকার নেতৃত্বে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গঠিত আল কায়েদার শাখাসমূহ

(বেশিরভাগই ২০০৫ এর পরে গঠন করা হয় কিন্তু পূর্ববর্তী বছরগুলোতে ডেভেলপ করা হয়)

AQAP, ইয়েমেনভিত্তিক (আল কায়েদা ইন এরাবিক পেনিনসুলা) এটি এই মুহূর্তে (২০১২) পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা আল কায়েদা শাখাগুলর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। তারা ইয়েমেনের আবিয়ান প্রদেশ নিয়ন্ত্রন করে সেখানে ইসলামিক শারিয়াহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারাই ইংরেজিতে ছাপানো ইন্সপায়ার ম্যাগাজিন শুরু করেন এবং ইংরেজিতে লেকচার দিয়ে পুরো বিশ্বের নজর কাড়া লেকচারার আনোয়ার আল আওলাকি তাদের সাথে যুক্ত ছিলেন, যিনি কয়েক বছর আগে ইয়েমেনে ড্রোন হামলায় শহীদ হন।

ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক (ISI): এটি AQI (আল কায়েদা ইরাক) এর নতুন সংস্করণ, ইরাকি আল কায়েদা সদস্যরা এটি পরিচালনা করছেন। মার্কিনীরা ইরাক ত্যাগের পর এটি আরও কার্যকর হয়।

আল কায়েদা ইসলামিক মাগরিব (AQIM) : মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনেসিয়া এবং প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুল নিয়ে এটি গঠন করা হয়েছে, যা সাহারা মরুভুমিতে অবস্থিত। AQIM ইউরোপেও প্রবেশ করেছে এবং ফ্রান্সেও এর সামান্য কিছুটা প্রভাব রয়েছে (যেহেতু ইসলামিক মাগরিবের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো থেকে আরবরা ফ্রান্সে গিয়েছিলো)।

আল শাবাব (যুবকেরা) : সোমালিয়া এবং আফ্রিকা।

বোকো হারাম (পশ্চিমা জীবন ব্যবস্থা হারাম) : আফ্রিকার নাইজেরিয়া।

আনসার আল দ্বীন (দ্বীনের সাহায্যকারী) : মালি।

আল কায়েদা সেন্ট্রাল :   এটি পাক-আফগান বর্ডারে অবস্থিত, কিন্তু মুল সদস্যরা অজ্ঞাত।

তালিবান (আফগানিস্তান) : এখনও মোল্লা ওমরের নেতৃত্বের অধীনে।

তেহরাক ই তালিবান পাকিস্তান (TTP) : হাকিমুল্লাহ মেহসুদের নেতৃত্বে

জাবহাত আল নুসরাহ (বিজয়ের মুখ) :ইসলামিক স্টেট অফ ইরাকের আমীর আবু বকর আল বাগদাদি সিরিয়াতে মুসলিমদের সাহায্য করার জন্য ISI এর প্রায় অর্ধেক সম্পদ দিয়ে জাবহাত আল নুসরাহ গঠন করেন। তিনি এর আমীর হিসেবে আবু মুহাম্মাদ আল গুলানিকে মনোনীত করেন। সিরিয়ার যুদ্ধে এটিই সবচেয়ে ভাল অস্ত্রে সজ্জিত এবং যুদ্ধ ও গরিলা যুদ্ধকৌশলে পারদর্শী মুজাহিদ গ্রুপ।সিরিয়ার যুদ্ধে এই গ্রুপের সাহসিকতা, দক্ষতা ও যুদ্ধকৌশলের জন্য এর উপর ইসলামপন্থীদের আস্থা পেয়েছে।

ইসলামিক মুভমেন্ট অফ উজবেকিস্তান (IMU) : এর লক্ষ্য হল ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে উজবেকিস্তানের অত্যাচারী শাসন ব্যবস্থা অপসারিত করা। এর মুল সদস্যরা পাক-আফগান বর্ডারে অবস্থান করছে।

লস্কর ই তায়্যিবা (LeT) : পাকিস্তানের এই মুজাহিদিন গ্রুপ ২০০৮ এ মুম্বাই অ্যাটাকে জড়িত ছিল। ইন্ডিয়াতে তাদের সেল আছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমন অনেক মুজাহিদ গ্রুপ বা সেল আছে, যা এন্টি-ইসলামিদের জন্য ভীতিজনক ব্যাপার। তাদের অনেকেই ঘুমন্ত সেল হিসেবে অবস্থান করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সঠিক সময়টি আসে।

অধ্যায় ৬ : বিশ্বব্যাপী পণ্য সরবরাহ রুট অবরোধ (২০০৬+)

দস্যু আবু বাসীর

আবু বাসীর (রাঃ) মক্কা এবং মদিনার মাঝের মরুভূমিতে বসে আছেন। তিনি মক্কার কাফেরদের নির্যাতন থেকে পলিয়েছেন এবং যেহেতু মদিনার মুসলমানদের সাথে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল (হুদায়বিয়া) মক্কাবাসীদের সাথে - তাই তিনি মাদিনায় যেতে পারবেন না। তারপর তিনি মক্কা থেকে আগত একটি বাণিজ্যিক মরুকাফেলা দেখে একটি কৌশল আটেন, যেহেতু তার সাথে মক্কাবাসীর যুদ্ধাবস্থা চলছিল - তিনি তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা অতর্কিত আক্রমণ করেন এবং কাফেলা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ নিজের কাছে রেখে দেন। অনুরূপ কাজ বারবার করতে থাকার কারণে মক্কার কাফেরদের কাছে তিনি মূর্তমান আতঙ্কে পরিনত হয়েছিলেন। উদ্ভূত পরিস্থিতি সামলানোর জন্যে তারা নবী মুহাম্মদ (সা:) কাছে আবু বাসীর এবং তার ছোট অস্ত্রধারী দলটিকে আক্রমণ বন্ধ করার আদেশ দিতে মিনতি করেছিল। করুণাময় রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু বাসীরকে আক্রমণ গুটিয়ে নিতে বলেছিলেন।

দ্বিতীয় ধাপে যে পথে আফগানিস্তান ও ন্যাটোর রসদ ও মালামাল আসা যাওয়া করে, সে পথে পশ্চিমা নেতৃত্বাধীন বাহিনীর রসদ সরবরাহ লাইন আক্রমণ করা। এই কারাভান গুলোতে জ্বালানীবাহী ট্রাক থেকে শুরু করে এমনকি হাম্বী, কখনও কখনও বিমান অংশ বিশেষ বহন করে।

এই যুদ্ধকৌশল ব্যবহৃত হয়েছিল রাশিয়ান জিহাদের সময় আফগানিস্থানে, সব ধরনের রসদ সরবরাহে সেনাবাহিনীর মাঝে প্রতিবন্ধকতা গড়ে তুললে সেনাবাহিনী অকার্যকর হয়ে পরে এবং বিপদাপন্ন হয়ে পরে। আল কায়েদা পাকিস্তানি তালেবান সদস্যদেরকে নিজস্ব সুবিধার জন্য এই যুদ্ধের কিছু গনিমত ব্যবহার করতে পারার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বাকিসব গনিমত লাভজনক দামে অনান্য ক্ষমতাধরদের কাছে বিক্রি করা হত। উদাহরণস্বরূপ একবার, মার্কিন বাহিনী উচ্চ সতর্কতা জারি করেছিল যখন তারা শুনতে পেল যে, পাকিস্তানি তালেবান সদস্যরা তাদের উপজাতি এলাকায় হাম্বী ড্রাইভ করে।

সোমালিয়ার মিলিওনিয়ার জলদস্যু

ওসামা মূলত বলেছিলেন যে আমেরিকা ও পশ্চিমাদের আক্রমণ করা হবে না, যদি -

১ - তারা যদি মুসলমানদের সঙ্গে ন্যায্য বাণিজ্য করে

২ - মুসলিম ভূমি থেকে তাদের ঘাঁটি সরিয়ে ফেলে

৩ - এবং ইসরাইলকে অন্ধ সমর্থন বন্ধ করে

যেমন কোনো সাম্রাজ্যবাদী দেশকে যদি বলা হয়, দুর্বল দেশগুলোকে ভীতিপ্রদর্শন না করার জন্য, তা তাদের কানে ঢুকার কথা না এবং বাস্তবে তাই হল।

এ অর্থনৈতিক আধিপত্যকে বন্ধ করার জন্য একটি বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের এখনই সঠিক সময়। তাই সকল আল কায়েদা কৌশল, অন্যান্য আল কায়েদা ব্রান্ডের ছড়িয়ে পড়ে। যেমন আফ্রিকা আল কায়েদা সম্পর্কযুক্ত সংগঠন হারাকাত আল শাবাব (অর্থ: যুব আন্দোলন) এবং এমন আরো ব্রান্ডের কার্যক্রম (যেমন, আনসার আল দ্বীন মালি, ইত্যাদি)।

আল কায়েদা সমুদ্রপথের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং কিভাবে 'গ্রামসম' জাহাজ মুসলিম দেশ সমূহের সমুদ্রপথে ভ্রমণ করে। এটা ছিল আল কায়েদার কাছে স্বর্ণের খনি খুজে পাবার মত, কয়েকটি ট্যাংক বা হুন্ডী চালানো আর একটি সম্পূর্ণ জাহাজ চালানো এক নয়, যা ফিরে পেতে অনেক ব্যবসায়ি এমনকি মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার দিতে ইচ্ছুক। যেহেতু, মুসলিম দেশ সমূহ প্রধানত বিশ্বের মাঝখানে (মিডিল ইস্ট) অবস্থিত, সেহেতু পূর্ব এবং পশ্চিম থেকে আশা জাহাজ সমূহ আটক করার মত অনেক কৌশল গ্রহণ করা যায়। সোমালি জলদস্যুরা তাই জাহাজসমূহ আটক করা শুরু করে, তারপর তা নিজেরা ব্যবহার সুরু করে অথবা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার গনিমত আদায় করে, এই টাকা ব্যবহার করে পরবর্তিতে তারা অনেক কাজ উদ্ধারে সামর্থ হয়। উপরন্তু আফগানিস্তানসহ যেসব মুসলিম দেশে তারা যুদ্ধ পরিচালনা করছে সে সব দেশে, সমুদ্র পথে ন্যাটোর যে রসদ ও মালামাল আসা যাওয়া করে, তা তারা বন্ধ করার পরিকল্পনা করে।
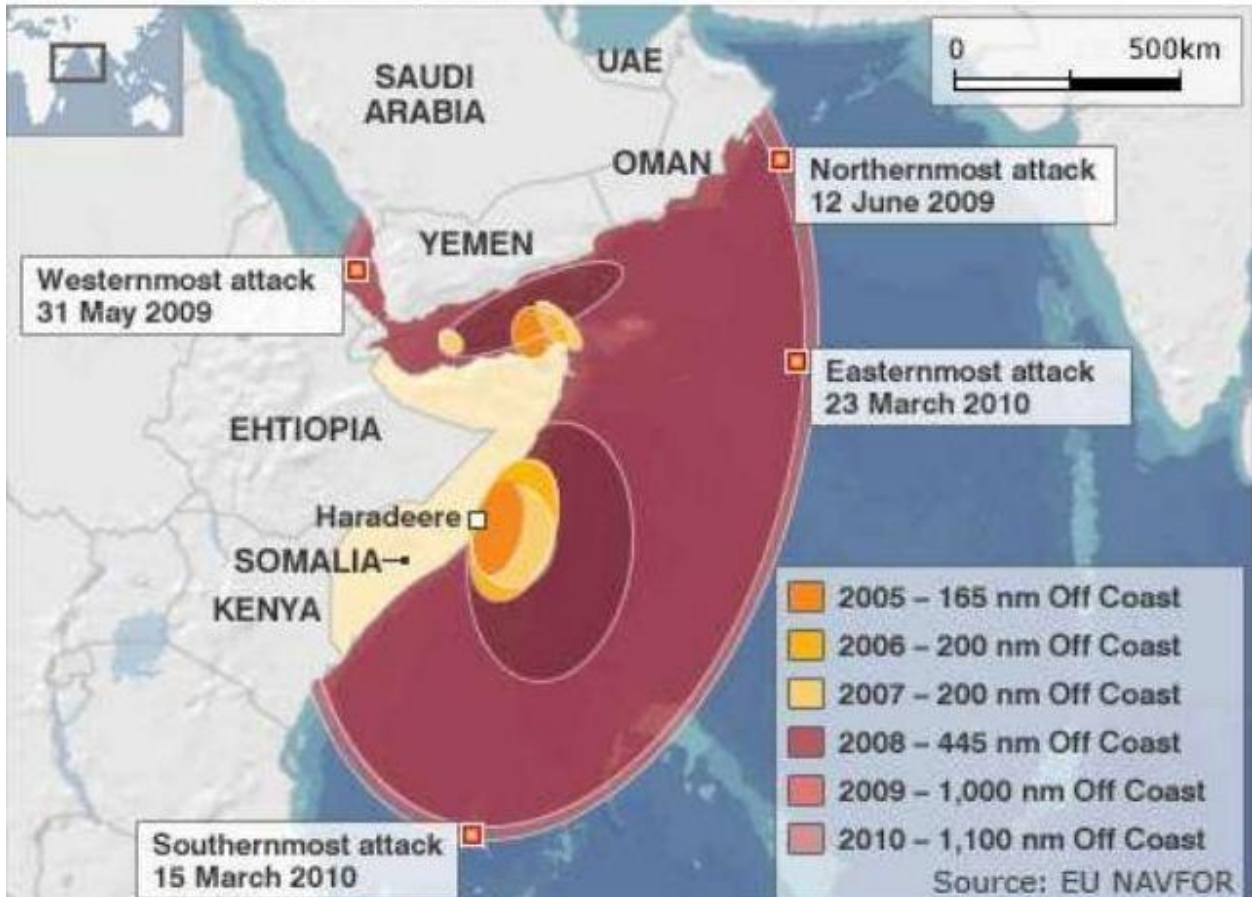
যখন মুক্তিপণের জন্য এই জাহাজ আটকানোর ঘটনা খুব সাধারণ হয়ে ওঠে তখন ওয়েস্টার্ন ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যসম্ভার রক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রার্থনা করেছিল। এবং সোমালি আল কায়েদা জলদস্যু মোকাবেলায় মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়েছে, যা আলকায়েদার আরেকটি যুদ্ধকৌশল ছিল, পানির মত বিপুল পরিমান ধনসম্পদ যুদ্ধে খরচ করানো যা ক্রমানয়ে তাদের অর্থনীতিকে ধ্বংস করবে। যেভাবে ২০ বছর আগে ইউএসএসআর অর্থনৈতিকভাবে ধসে গিয়েছিল।

মালবাহী উড়োজাহাজ (এ্যারোপ্লেন) আক্রমনের পরিকল্পনা

আলকায়েদা সমুদ্র পথে আক্রমনের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেল, এবং মালবাহী (কার্গো) এ্যারোপ্লেনের লক্ষ্য করা শুরু করলো। এই পশ্চিমা সরকারগুলো উচ্চতর নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার লক্ষে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার অর্থব্যয় করে যা পানির মত বিপুল পরিমান ধনসম্পদ ব্যয় করে অর্থনীতিক দেউলিয়া হবার এক ধাপ অতিক্রম করে।

এটা উল্লেক্ষ যে এর দ্বারা জায়নিস্টরা সুবিধা নেবার চেষ্ঠা করে এবং নিজেদেরকে পৃথিবীর কাছে 'বড় ভাই' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে, তারা জনগনের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলাতে সুরু করে এমনকি তারা নিজেদের ঘরে কি করছে তা নিয়েও। মানুষ তার দৈনন্দিন সুবিধার জন্য ক্রমবর্ধমান ভাবে অনিবার্য হয়ে উঠা ডিভাইস সমূহ (মোবাইল ফোন , ক্রেডিট কার্ড) মূলত জীয়নস্ট এবং সরকার সমূহের আড়িপাতার সরঞ্জামে পরিনত হয়েছে।

গোপন অশরীরী সেনাবাহিনী (লস্কর আল জিল)

মুসলিম বিশ্বে আলকায়েদার ক্রমবর্ধমান আত্মবিশ্বাসী উপস্থিতি, তাদেরকে উন্নয়নের পরবর্তী ধাপ আরম্ভ করার অনুপ্রাণিত করে। যেখানে পশ্চিমা সমরকৌশলীরা অন্ধ ভাবে বিশ্বাস করে আসছিল যে, আফগান-পাক বর্ডারে আলকায়েদার কার্যক্রমই তাদের জন্য প্রধান হুমকি। এই সময়ের মধ্যে আলকায়েদা তাদের ভবিষ্যত কৌশল পরিকল্পনা সফল করার জন্য, মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশে থেকে যুদ্ধ বিশেষজ্ঞদের জমায়েত করছিল। এই সমর বিশারদরাই হলো গোপন অশরীরী সেনাবাহিনী (লস্কর আল জিল), যা গঠন হয় মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশে থেকে যুদ্ধ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা।

এ গোপন সংগঠনটি তখনি গঠন হয় যখন মার্কিনরা আনুমান করে যে আফগানিস্থানে আলকায়েদার সদস্য ১০০ বেশি হবে না, আরো ৩০,০০০ মার্কিনসেনা পাঠালে আলকায়েদা ও তালেবানকে সমূলে ধ্বংস করা যাবে।

বাস্তবে এ গোপন প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন যুদ্ধ সংগঠিত এলাকায় (আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরাক, সোমালিয়া, ইয়েমেন, ও সম্ভাব্য অন্য আরো যুদ্ধ ক্ষেত্র) ভ্রমণ করে -ভবিষ্যতে ইসলামকে রক্ষার জন্য, নতুন গেরিলা কৌশল ও নতুন নুতন যুদ্ধ ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। এই নতুন প্রজন্মের সাফল্যের একটি কারণ হচ্ছে তাদের অধিকাংশই গুপ্তচর সংস্থার নজরদারি থাকতে না পারা।

<u>সদস্যসমূহ:</u>

ইলিয়াস কাশ্মীরি (বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর গেরিলা সমর সমরকৌশল বিশারদ , প্রতিষ্ঠাতা - ৩১৩ ব্রিগেড)।

হারুন - প্রাক্তন পাকিস্তান সেনাকর্মকর্তা, তালিবানের জন্য নতুন ধরনের গেরিলা যুদ্ধকৌশল প্রবর্তন করেন।

সিরাজুদ্দিন হাক্কানী (বিখ্যাত আফগান সমরকৌশল বিশারদ জালালুদ্দিন হাক্কানীর পুত্র) - তিনি সর্বজনবিদিত ভয়ঙ্কর তালিবান গ্রুপ - হাক্কানী নেটওয়ার্ক এর নেতৃত্ব দেন।

জিয়াউর রহমান ও মুহাম্মদ নেক - আলকায়েদার প্রতি আনুগত্যশীল নতুন প্রজন্মের তালেবান কমান্ডার। তারা নিজ গোত্রের উপর অন্ধ আনুগত্য না থাকার প্রবণতা চালু করেন (তালিবানদের পুরাতন প্রজন্মের কাছে নিজ গোত্রের আনুগত্য করার প্রবনতা ছিল)। নতুন প্রজন্মের তালিবানরা প্রধানত আরবি ভাষায় কথা বলে এবং অন্য কারো আগে আলকায়েদা নেতাদের প্রতি আনুগত্যশীল।

আসলে, গোপন সেনাবাহিনী একটি অনমনীয় তরুণ প্রজন্ম যারা কখনো শান্তি দেখেনি (গত ৩০ বছর ধরে), অশরীরী ব্যক্তিত্ব (গোয়েন্দা সংস্থার ধরা ছোয়া থেকে মুক্ত), ১০০% আলকায়েদা মতাদর্শে অনুগত, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য – পশ্চিমা ও জায়নিস্ট আধিপত্য থেকে জেরুজালেম সহ সকল মুসলিম ভুখন্ড রক্ষা করা।

অধ্যায় ৭ : আরব বসন্ত (২০১১ +)

আরব বসন্তের শুরু

২০১০-২০১১ তে আরবে আরব যুবকরা তাদের অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করলো যারা কিনা মধ্য প্রাচ্যে ১০০ বছরের বেশী সময় ধরে পশ্চিমা শাসন প্রতিষ্ঠা করে আসছে। এই বিদ্রোহের কারনে মুসলিম বিশ্বে অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। এটি ভালোভাবেই জানা যে যদি সত্যিকারের গণতন্ত্র মুসলিম বিশ্বে স্থাপন করা হয়, তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা ইসলামিক শাসন বাস্তবায়নের জন্য এমন একটি দলকে ভোট দিবে যারা তাদের দেশ থেকে পশ্চিমা আধিপত্য ও জায়নিস্ট ইহুদীদেরকে তাড়িয়ে দিতে চায়। ওই ১% (জায়নিস্ট), যারা কিনা পুরো বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুসলিমদের সম্পদগুলো লুট করে, তারা জানত যে মুসলিমরা যদি ইসলামিক নেতৃত্ব চায় তবে সেটা অনিবার্য হয়ে পড়বে, আর যদি ওই স্বৈরশাসন চলতে থাকে তবে মুসলিম জনতা বিদ্রোহ চালিয়ে যেতে থাকবে এবং এমনকি অস্ত্রও হাতে তুলে নিতে পারে ও মিসরকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে (যা কিনা ইসরায়েলের পাশেই)।

মিসর এবং বিদ্রোহ চলা অন্যান্য দেশগুলোতে গণতান্ত্রিক উপায়ে ভোট গ্রহনের এক আচমকা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় (১০০ বছরেরও বেশী সময় ধরে চলে আসা স্বৈরশাসনের পর)। নিজেদের মুখ রক্ষার জন্যই আমেরিকা এটি করেছিলো কারন পুরো বিশ্ব এই বিদ্রোহের খবর দেখছিল এবং যদি আমেরিকা ওই দেশগুলোর জনগনের নিজেদের নেতাকে খুজে নেওয়ার অধিকার সমর্থন না করত তাহলে তাদের ওই স্বৈরশাসনকে সমর্থন করার ব্যাপারে আমেরিকার ভণ্ডামি প্রকাশ হয়ে যেত।

মিসর, তিউনিসিয়ার মতো দেশগুলোতে সংঘটিত নির্বাচনে ইসলামপন্থী সংঘটনগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ ভতে জয়লাভ করে। তারা ছিল মুসলিম ব্রাদারহুড এবং এই ধরনের ইসলামপন্থী সংঘটন যারা গণতন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছিল এবং একারনে তারাও পশ্চিমা অর্থনৈতিক কতৃত্ব ও চাপের নিচে ছিল।

আল কায়েদার লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে মুসলিম ব্রাদারহুড যেভাবে সহায়ক হল

আল কায়েদার মতাদর্শ মুসলিম ব্রাদারহুডের মতো নয়। আল কায়েদার ফোকাস হল মুসলিম বিশ্বকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত করা এবং একে অপসারণ করা। তারা বিশ্বাস করে এটা করার পরই পশ্চিমাদের অর্থনৈতিক আধিপত্য দূর করে সত্যিকারের ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে। বর্তমানে মুসলিম ব্রাদারহুড পশ্চিমা আধিপত্যের ভিতরে থেকেই দেশ পরিচালনা করছে, যার কারনে তারা সত্যিকার ইসলামিক

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আর অনেক মানুষই এটা বুঝতে পারল যখন তারা দেখল মিসরের মুসলিম ব্রাদারহুড প্যালেস্টাইন স্বাধীনের ব্যাপারে সফল হতে পারছে না। গনতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ইসলামপন্থী দলগুলোকে ক্ষমতার আসনে বসানো তাদের জন্য স্বল্প মাত্রার সফলতা নিয়ে আসবে।

পশ্চিমারা চেষ্টা করবে মুসলিম ব্রাদারহুডের মতো ইসলাম পন্থী দলগুলোর দীর্ঘ মেয়াদী ইসলামি এজেন্ডাগুলো সুনিপুণ ভাবে বাধা দিতে, যাতে তারা আরব মুসলিমদের সেই আশা পুরনে কখনও সফল হতে না পারে। প্রকৃতপক্ষে নতুন প্রজন্মের মুসলিম যুবকেরা যাদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান আছে (দ্বীনের ব্যাপারে তাদের অভিব্যক্তি দেখে যা বুঝা যায়), তারা আল কায়েদার সাথে যুক্ত দলের দিকে ঝুকে পড়বে – যারা প্যালেস্টাইনকে স্বাধীন করে এখানে ও পুরো বিশ্বে ইসলামিক শারিয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে চায় (অর্থাৎ খিলাফাহ কায়েম করতে চায়)।

আরও সোজাভাবে বলতে গেলে, মোডারেট ইসলাম পন্থী সরকার বা গণতান্ত্রিক সরকার যারা কিছু নির্দিষ্ট ইসলামিক ব্যাপারে জনগণকে স্বাধীনতা দেয়, যা কিনা মুসলিমদের গতানুগতিক ইসলাম অনুভব করতে দেয়, এর দ্বারা তারা বুঝতে পারবে যে মুসলিম ব্রাদারহুড টাইপ সরকার পুরোপুরিভাবে ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করছে না; এর ফলে তারা আল কায়েদার দিকে ঝুকে পড়বে যাদের মধ্যে আদর্শিক ইসলামিক খিলাফতের প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তবিক অর্থেই অনুপ্রেরণা রয়েছে।

এর কারনে জায়নিস্টদের প্ল্যান উভয়সংকটের মধ্যে পড়েছে – হয় তাদের মুসলিম ব্রাদারহুডের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার ব্যাপারে লড়াই করতে হবে, যার কারনে লোকেরা দ্রুত আল কায়েদার সাথে যোগ দিবে অথবা তারা মুসলিম ব্রাদারহুডকে তাদের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে সামনে এগুতে দিবে, যা মুসলিমদেরকে আল কায়েদার খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার আইডিয়ার সাথে একত্রিত করবে।

সিরিয়ার বিদ্রোহ

সিরিয়ার বিদ্রোহ হল একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ঘতে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা সমূহের মধ্যে একটি দুঃখজনক মোড়।

২০১১ সালে শুরু হওয়া আলাওয়ীদের (শিয়াদের একটি উপদল) স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যাপারে সিরিয়ার জনগণ যথেষ্ট সাহসী ছিল। ১৯৭০ সালের প্রথম দিকে শুরু হওয়া আসাদ পরিবারের এই স্বৈরশাসন শুরু হয়েছিলো হাফিয আসাদকে দিয়ে এবং এখন তার ছেলে বাশার আল আসাদ প্রেসিডেন্ট হিসেবে আছে। সিরিয়ার জনগণ তাদের অত্যাচারী শাসক আর গোপন পুলিশ (শাবিহা, যার অর্থ হল প্রেতাত্মা) দিয়ে নির্যাতিত হয়ে আসছিল এক দীর্ঘ সময় ধরে। সিরিয়ার জনগনের অর্ধেকেরও বেশী লোক ছিল বাশারের স্বৈরতন্ত্র রক্ষার কাজে নিয়োজিত গোয়েন্দা (তারা তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে ভিত থাকার কারনে)। কোন মানুষকে যদি সামান্যও বিদ্রোহী, “অতিরিক্ত” ধার্মিক বা আসাদ-বিরোধি হিসেবে সন্দেহ করা হত, তখন তার পুরো পরিবারের লকজন ধরে নিয়ে এসে ধর্ষণ,কারারুদ্ধ,নির্যাতন, অঙ্গ-প্রত্তঙ্গ কেতে ফেলার মতো শাস্তি দেওয়া হতো এবং মেরে ফেলা

হতো। এই স্বৈর শাসন আর আতঙ্ক সিরিয়াতে প্রায় ৫০ বছর ধরে (১৯৬৩-২০১২ +) টিকে আছে। হাজার হাজার সিরিয়ানদেরকে আলাওয়ী শিয়ারা ধর্ষণ ও হত্যা করেছিলো (এখনও করছে) যারা সংখ্যা গরিষ্ঠ সুন্নিদেরকে তাদের শত্রু মনে করে।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"যখন শামের (সিরিয়া, জর্ডান, প্যালেস্টাইন) লোকেরা পথভ্রষ্ট হবে তখন তোমাদের মধ্যে কোন কল্যাণ থাকবে না। আমার উম্মতের মধ্য থেকে একদল লোক আল্লাহর সাহায্য পেতে থাকবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা শেষ সময় পর্যন্ত তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" (তিরমিযি ২/৩০ –নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত)

একইভাবে, শামের লোকেরা যখন ভাল হয়ে যাবে তখন মুসলিমদের বাকি অংশও ভাল হয়ে যাবে এবং সফল ও সমৃদ্ধ হবে।

যেহেতু পশ্চিমা শক্তি ও জায়নিস্ট্ররা মিসরের এই পরিবর্তনটি সাপোর্ট করেছিলো (২০ বছরের বেশী সময় ধরে চলা হোসনী মুবারকের স্বৈরতন্ত্রকে ২০১০-১১ এর পর গনতন্ত্রে পরিবর্তন করা) মিসরের জনগনের অভ্যুত্থানের কারনে, তাই একনায়কতান্ত্রিক বাশার আল আসাদকে সাপোর্ট করা তাদের জন্য একটি ভণ্ডামিপূর্ণ আচরণ হিসেবে প্রকাশ হবে।। এর কারনে সিরিয়ার নির্যাতিত বিদ্রোহীদের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকল এ আশায় যে বাশার আল আসাদের সরকার (যারা কিনা জায়নিস্ট ইসরাইলকে ইসলামপন্থীদের কাছ থেকে রক্ষা করছিলো) ওই অভ্যুত্থানকে দমন করতে পারবে।

<u>সিরিয়ায় সশস্ত্র বিদ্রোহ</u>

শাবিহারা (সিরিয়ার গোপন পুলিশ) শান্তিপূর্ণ মিছিলকারীদের উপর গুলি চালান শুরু করলো এবং তারা বিশ্বের অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছে সাহায্য চাইল। কিন্তু বিশ্বের কোন শক্তিই তাদের সাহায্য করলো না। ধীরে ধীরে কিছু নিম্ন পদস্থ সিরিয়ান সৈন্য সেনাবাহিনী ছেড়ে দিয়ে যেসব অস্ত্রধারী বিদ্রোহী সুন্নিদের রক্ষা করছিলো তাদের শক্তি আরও বৃদ্ধি করলো। তখন সেই সশস্ত্র বিদ্রোহ ধর্মীয় যুদ্ধের দিকে গরাতে লাগলো এবং অস্ত্রধারী বিদ্রোহীরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

বিদ্রোহীরা জামাতে নামায আদায় করছেন

সিরিয়ার অভ্যুত্থানে আল কায়েদার সুচনা (২০১১-১২)

ইসলামিক স্টেট অফ ইরাকের আমীর আবু বকর আল বাগদাদী সিরিয়ান মুসলিমদের সাহায্য করার জন্য তার অন্যতম সেরা মুজাহিদ আবু মুহাম্মাদ আল গুলানিকে ।S। এর অর্ধেক সম্পদ দিয়ে সিরিয়াতে জিহাদ করার জন্য পাঠান এবং এর নাম দেন জাবহাত আল নুসরাহ।

জাবহাত আল নুসরাহ সিরিয়ান বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে লাগলো কারন তারা ছিল সুন্নি (সুন্নি ও সালাফিরা সুন্নাহ অনুসরণ করে যা শিয়ারা করে না)। বিদ্রোহীরা দলত্যাগ করা সৈন্যদের কাছ থেকে ভারী অস্ত্র লাভ করে এবং অন্যান্য সিরিয়ান সৈন্যদের টাকা দিয়ে তাদের কাছ থেকে কিনে নেয়। ইসলামিক স্টেট অফ ইরাকের সাহায্যে জাবহাত আল নুসরাহও শক্তিশালী অস্ত্র ও বোমা তৈরি করতে পারে এমন মুজাহিদিন কে পান। এর ফলে নতুন গড়ে উঠা বিদ্রোহী সেনাদের নিয়ে গঠিত FSA (ফ্রি সিরিয়ান আর্মি) শক্তিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বড় বড় সফলতা পায়। আমি যে সময়ে এ লেখাটি লিখছি (নভেম্বর ২০১২) তখন সিরিয়ায় সরকার পক্ষ ও বিদ্রোহীদের মধ্যে ভারসাম্য দেখা যাচ্ছে।

পশ্চিমারা যখন বুঝতে পারল যে (২০১২ এর মধ্যবর্তী সময়) আসাদের সরকার আর বেশী দূর যেতে পারবে না, তখন তারা ঠিক করলো তারা সিরিয়ার উপর আধিপত্য চালু রাখার জন্য সিরিয়ার বিদ্রোহকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে সাপোর্ট করবে এবং এটা নিশ্চিত করবে যে ওই অভ্যুত্থানের শেষ ফলাফল হবে একটি গণতান্ত্রিক সিরিয়া যা পশ্চিমা স্বার্থ অনুযায়ী চলবে। (আরব লোকেরা একে অবসস ভণ্ডামিই মনে করবে যেহেতু প্রায় ৫০ বছর ধরে চলে আশা আসাদ সরকারকে কোন পশ্চিমা শক্তি সমালোচিত করেনি অথবা সুন্নিদের বিরুদ্ধে এতদিন চলে আশা নির্যাতন দেখে আসার পরও একে অগণতান্ত্রিক বা মানব অধিকার বিরোধী বলে আক্ষ্যা দেয় নি। আর এখন তারা তাদের রক্তে বয়ে যাওয়া আদর্শ অনুযায়ী সিরিয়া শাসন করার জন্য ইসলামিক অভ্যুত্থান কারীদের সমালোচনা করছে)

* **আপডেট** : কিছুদিন আগে FSA ছেড়ে আসা এক উচ্চপদস্থ কম্যান্ডার FSA এর আসল চেহারা ফাঁস করে দেন এক ভিডিওতে। FSA এর এই নেতা মুজাহিদিনদের সাথে যোগ দেয়ার পর যা যা বললেন -

- বিশ্বের প্রায় সব দেশের গোয়েন্দা সংস্থা FSA এর সাথে জড়িত, যেমন জর্ডান, সৌদি, কাতার এবং আরব-আমিরাত, এছাড়াও পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে আছে USA, UK এবং France এর গোয়েন্দাসংস্থা গুলো।

- FSA এর যেকোনো মিটিং এ তারা থাকবেই, হোক তা স্টাফদের মিটিং অথবা সামরিক মিটিং।

- প্রথমে FSA এর অর্থ যোগান দিত কাতার, পরে সৌদি গোয়েন্দাসংস্থা এ প্রজেক্ট নিয়ে নেয় এবং সৌদি যুবরাজ সালমান এর দায়িত্ব নেন।

- জর্ডান ও পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলো FSA সদস্যদের প্রশিক্ষন দেয়; আর এটা সবাই জানে যে জর্ডান গোয়েন্দা সংস্থা মানে ইসরায়েল গোয়েন্দা সংস্থা ।

ভিডিওটি পাওয়া যাবে এই লিঙ্কে : http://www.youtube.com/watch?v=BkfW1CWXevQ

সিরিয়া : নতুন আফগানিস্তান

সিরিয়া ৮০ ‘র দশকের আফগানিস্তানে রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের মতো পরিনত হল, যেখানে বিশ্বের শক্তিগুলো একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলো এমন একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যা তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য হবে, অপরদিকে ৮০ ‘র দশকের পাকিস্তানের ভুমিকায় অবতীর্ণ তুরস্ক পালিয়ে আশা আফগানদের আশ্রয় দিবে। বিদ্রোহীরা তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ইসলামের দিকে ঝুকিয়ে নিল (পুরো বিশ্ব তাদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করার পর)।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আশা মুজাহিদিনদের কারনে এ সম্ভাবনা দেখা গেল যে মুজাহিদিনের মাধ্যমে সিরিয়াতে ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে এবং আমেরিকা অথবা ইসরাইল সন্ত্রাস দূরীকরণের দোহাই দিয়ে তাকে আক্রমণ করতে যাবে। আর এটা তো জানাই আছে যে ইসরাইল – আমেরিকা জোট ইতিমধ্যে ইসলামিক স্টেট অফ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। ইহুদিদের ধর্ম গ্রন্থেই এই ভবিষ্যৎ বাণী উল্লেখ করা আছে যে দুর্নীতি পরায়ণ ইসরাইলের সাথে ইসরাইলের উত্তরের এক লোকের সাথে সংঘর্ষ ঘটবে এবং শেষ বিজয় হবে পাহাড়ি লোকদের। (ভবিষৎবাণীর অধ্যায়)।

যে দেশগুলোতে আমেরিকা এক যোগে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে সেগুলো হল ইরাক, ইয়েমেন, আফগানিস্তান এবং অতি শীঘ্রই সিরিয়া।

এই দেশগুলো আন্তর্জাতিক ইসলামিক জিহাদের পুনরজাগরনের আসল কারন হতে পারে যা পরবর্তীতে শেষ যুগে সংঘটিত যুদ্ধের দিকে গড়াবে (যার ব্যাপারে মুসলিম,খ্রিস্টান ও ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থে বলা আছে) যার ফলে অবৈধ ইসরাইলের ধ্বংস হবে।

পরিশেষে বলা যায়, আমেরিকা মুসলিমদের বিরুদ্ধে এক লোভনীয় যুদ্ধ শুরু করার মাধ্যমে নিজেকে এবং ইসরাইলকে (জাকে সে রক্ষা করতে খুব ইচ্ছুক) ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।

আল কায়েদা : মুসলিমদের জন্য কি এটি নতুন ভাল কেউ ?

অনেক পশ্চিমা লোকেরাই যুক্তরাষ্ট্রের (UN) এই কাজগুলকে অপকর্ম হিসেবে বিবেচনা করা শুরু করেছে যেগুলোর মধ্যে রয়েছে সিরিয়াতে ৩০,০০০ লোককে হত্যা করা। আর যুক্তরাষ্ট্র এই লোকগুলোর সমর্থনে কিছুই করে নি। এছাড়া তারা আল কায়েদার অনুগত জাব হাত আল নুস রাহ এর উপস্থিতি (বিদ্রোহীদের মাঝে) জানার পরও বিদ্রোহীদের সমর্থনের অপশন গ্রহণ করেছে।

যদি ন্যাটো এবং মার্কিন বাহিনী সিরিয়ায় হস্তক্ষেপ করে তবে তারা কি সিরিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে জাব হাত আল নুস রাহ এর সাথে হয়ে একত্রে লড়াই করবে ? এটি কি মুজাহিদিন দেরকে সাপোর্টার বা বা মিত্র বাহিনীতে পরিনত করবে না ? এই দ্বিমুখী প্রশ্নগুলো সহজেই মানুষের মনে চলে আসে।

বরং ন্যাটো ও মার্কিন বাহিনী দেরিতে পাঠানো, আল কায়েদাকে সিরিয়ান ও বিশ্বের সকল মুসলিমের কাছে হিরো বানিয়েছে যেহেতু আল কায়েদা ছাড়া আর কেউই এই দুর্বল ও নির্যাতিত লোকদের পাশে দাড়ায়নি। এতে করে সিরিয়াতে জিহাদিদের সংখ্যা ও আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায় এবং আমেরিকা আল কায়েদার শুরু থেকেই (প্রায় ২০ বছর আগে) এটি না হওয়ার ব্যাপারে সর্বাত্মক চেষ্টা করে আসছিল।

এমনকি নামধারী মুসলিম এবং বেসামরিক মুসলিম যারা আল কায়েদাকে চরমপন্থি সন্ত্রাসী দল হিসেবে চিনত (মনে করত তারা নিরীহ মানুষদের হত্যা করে), তারা এখন তাদেরকে হিরো হিসেবে মনে করে কারন তারা সিরিয়ার লোকদেরকে অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে বাচাতে আসলো যখন পুরো বিশ্ব তাদের একলা ফেলে রাখল। এটি আল কায়েদার নতুন একটি কৌশল যে তারা এমন কিছু নতুন গ্রুপ তৈরি করবে যা আল কায়েদার সাথে সম্পৃক্ত এমন কোন নাম বহন করবে না তবে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই থাকবে, এভাবে আল কায়েদা আরও শক্তিশালী হচ্ছে।

অধ্যায় ৮ : ওসামাকে হত্যা করা হল

<u>হত্যার সূচনা</u>

পশ্চিমা রিপোর্ট অনুসারে, CIA ওসামা বিন লাদেনের পত্রবাহককে অনুসরণ করা শুরু করলো, জাকে দিয়ে শেষ এক লোকের কাছে চিঠির মাধ্যমে ম্যাসেজ পাঠান হতো যে কুয়েতি হিসেবে পরিচিত।

তারা বুঝতে পারল যে ওসামা পাকিস্তানের এবোটাবাদের একটি বিল্ডিঙে তার পরিবার নিয়ে বাস করছেন। তারা নিশ্চিত ভাবে জানতে পারল যে ওসামা এখানে বাস করছেন, তাই তারা এখানে কয়েক মাস ধরে নজর রাখতে থাকল। তাদের এই ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা বাড়তে লাগলো এবং তারা ওসামাকে হত্যা করার রিস্ক নেওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছা করলো কারন পশ্চিমের বিরুদ্ধে অকল্পনীয় ভাবে আল কায়েদার হুমকি বেড়ে গিয়েছিলো।

ওসামাকে গুপ্তহত্যার ব্যাপারে তাদের অনেক পরিকল্পনা ছিল – একটি বোমা পাঠানোর মাধ্যমে পুরো বিল্ডিং ধ্বংস করে দেওয়া (ছবি) কিন্তু তারা এটা বাদ দেয় কারন এটার কারনে বিশ্বের মানুষদের মনোযোগ অন্যদিকে যাবে যা একদম অপ্রয়োজনীয় এবং পাক-আমেরিকা সম্পর্কের নেতিবাচক প্রভাব পরতে পারে, যদি ওসামা সেই বিল্ডিঙে তাদের ধারনা অনুযায়ী বাস না করে থাকে। অনেক সিদ্ধান্তের পর তারা ঠিক করলো তারা ৬ সদস্য বিশিষ্ট নেভী সিল টীম পাঠাবে ওই বিল্ডিং আক্রমণ করার জন্য। যদি তারা ওসামাকে পায় তবে তাকে হত্যা করবে এবং যদি তিনি সেখানে না থাকেন চুপচাপ সেখান বেরিয়ে থেকে যাবে এবং স্টিলথ হেলিকপটারে (যা এর আগে কোন মানুষ দেখেনি) করে ফিরে যাবে। তারা সেটাই করলো। তারা বিল্ডিং আক্রমণ করলো এবং পশ্চিমা রিপোর্ট অনুযায়ী ওসামা সেখানেই ছিলেন, তাকে সেখানে গুলি করে হত্যা করা হয়। কিন্তু স্টিলথ হেলিকপ্টার ক্র্যাশ করেছিলো। রিপোর্ট অনুযায়ী, তারা ওসামার লাশকে সমুদ্রে সমাহিত করে যাতে ‘তার কবরকে কেন্দ্র করে কেউ মাযার না বানাতে পারে’। তালিবান সোর্স থেকে নিশ্চিত জানা যায় যে তার জীবন অবসান হয়েছে কিন্তু তারা এই ব্যাপারে পুরো নিশ্চিত না যে তাকে হত্যা করা হয়েছে কিনা। অনেকেই বলে থাকেন যে ওসামা আগেই মারা গিয়েছিলেন, তাকে হত্যার নাটক সাজানোর মাধ্যমে আমেরিকা তাদের জনগনের কাছে এই সাহসী বিজয় উপস্থাপন করতে চায়।

ওসামাকে হত্যা করার মাধ্যমে কি আল কায়েদার আদর্শকে শেষ করে দেওয়া হল ?

না। ওসামাও একথা বলতেন যে তিনি আল্লাহর এক দাস মাত্র এবং যদি তিনি মারা যান তবে তার পরেও সংগ্রাম চলতে থাকবে।

মার্কিন প্রতিবেদন অনুসারে জানা যায় যে (চিঠি থেকে জানা যায়) ওসামা তার ওই ঘরে এ ব্যাপারে দুঃখিত ছিলেন যে এর অনেক মুল সদস্যকে ড্রোন হামলায় হত্যা করার ফলে আল কায়েদা নিঃশেষ হতে চলেছে। কিন্তু আমরা ভালোভাবেই জানি যে আল কায়েদার সিনিয়র সদস্যরা সতর্কতা মুলক ভাবে তাদের নতুন জেনারেশনের সদস্যদের কম্যান্ডার ও লিডার হিসেবে সুপ্রশিক্ষন দিয়ে রেখেছিলেন। আল কায়েদার নাম যোগ না করে নতুন কোন নামে বিভিন্ন গ্রুপ গঠন করার ব্যাপারে ওসামার আইডিয়া, যাতে ওই দলের সাথে পূর্বে ঘটে যাওয়া কোন ভুলের চিহ্ন না থাকে এবং এতে মতাদর্শও টিকে থাকবে। তাই ইয়েমেনে আনসার আল শারিয়াহ (ইসলামিক শারিয়াহ'র সাহায্যকারী), ইরাকে ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক, সিরিয়াতে জব হাত আল নুস রাহ এবং আরও অনেক শাখা যা এই বইতে ইতিমধ্যে উল্লেখ করা আছে। এসব জিহাদী গ্রুপগুলো আল কায়েদার মতাদর্শ ধারন করে কিন্তু তারা অন্য নামে কাজ করছে যাতে আল কায়েদার ঘটা পূর্ববর্তী ভুলের কারনে তাদের কাজের উপর কোন নেতিবাচক প্রভাব না আসে।

ওসামার স্বপ্ন হল সত্যি

ওসামা এই ব্যাপারটা পুনরজাগরিত করতে চেয়েছিলেন যে দ্বীনকে রক্ষা করতে মুসলিমদের জেগে উঠতে হবে এবং বহির্বিশ্বের আনুগত্যের আওতা থেকে বের হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। ওসামাকে হত্যার পূর্বেই আল কায়েদার মতাদর্শ তোরা বোরা পাহাড়ের গুহা থেকে শুরু হয়ে আফগানিস্তান,পাকিস্তান,ইরাক,লিবিয়া,উজবেকিস্তান,চেচনিয়া,ইয়েমেন,সমালিয়া,সুদান,মরক্কো,তিউনিসিয়া এবং বিশ্বের আরও অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি যে আদর্শ পুনরজাগরিত করে গেছেন তার কোন বর্ডার নাই এবং তা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর নির্ভরশীলও নয়। এটি এমন একটি মতাদর্শ যা মুসলিম ভূখণ্ডগুলো থেকে পশ্চিমা ও জায়নিস্ট আধিপত্য বিতাড়িত করতে চায়। এই মতাদর্শ এখন একজন যোগ্য নেতার জন্য অপেক্ষা করছে (ইমাম মাহদি –এক হিদায়াত প্রাপ্ত নেতা) যিনি এক পতাকার নিচে সব মুসলিমের নেতৃত্ব দিবেন জেরুজালেম স্বাধীন করার সময়।

অধ্যায় ৯ :নিকট ভবিষ্যতে যা হতে পারে (২০১২+)

<u>বর্তমান পরিস্থিতি</u>

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য যা কিনা অস্থিতিশীল, আল কায়েদার দ্বারা অনুপ্রাণিত নতুন প্রজন্মের দ্বারা পূর্ণ, সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ডা সমর্থন করে এমন শাসকদের পতন এবং নিয়মিত ভাবে আল কায়েদা কতৃক সাম্রাজ্যবাদীদের বিভিন্ন ইন্টারেস্ট যেমন পাইপলাইন (যার পরিবহন খরচ কম) হামলা, তেল ও গ্যাসের রিসোর্স গুলোতে হামলা – পশ্চিমা বিশ্ব ও ইসরাইল বিশ্বব্যাপী ইসলামের পুনরজাগরনের কারনে উভয়সঙ্কটে পড়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ধীরে ধীরে আরও গরীব হচ্ছে এবং ক্রমাগতভাবে এর জনগণ মুসলিমদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হচ্ছে।

<u>এরপর কি হতে পারে –আধুনিক ক্রুসেড ?</u>

শেষ দিবসের ভবিষৎবাণীগুলো থেকে জানা যায় ইউরোপিয়ানরা খ্রিস্টান হিসেবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে (কারন যখন কিছুই করার থাকে না তখন গরিব লোকেরা তাদের ধর্ম থেকে ফিরে আসে)
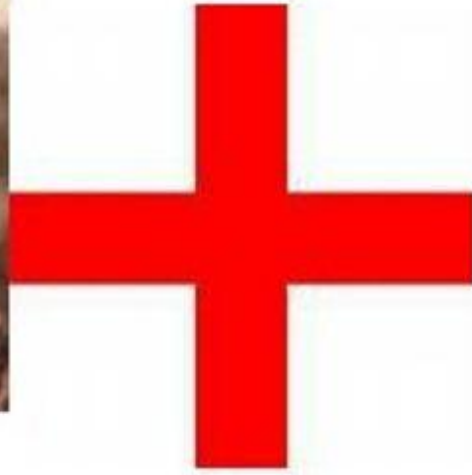
বামে – ১০০০ বছর পূর্বে একজন ক্রুসেডার, ডানে – ইউরোপের একটি দেশ ইংল্যান্ডের পতাকা।

নোট : ইউরপিয়ান পতাকাগুলোতে এখনও ক্রস দেখা যায়, যদিও তারা নিজেদের ধর্ম নিরপেক্ষ জাতি হিসেবে দাবী করে। এটি থেকে বুঝা যায় তারা এখনও প্রস্তুত ভবিষ্যতে আগত ক্রুসেড যুদ্ধের জন্য।

মুসলিম নেতৃত্বের উপর পুরো প্রভাব হারিয়ে ফেললে আধুনিক ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু হবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ব্যানারের নিচে। এবং এই যুদ্ধ মালাহামার যুদ্ধের [মাংসের যুদ্ধ (যুদ্ধে প্রচুর নিহতের সংখ্যার কারনে)] দিকে বিশ্বকে গরিয়ে নিয়ে যাবে, যা খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থে আরমাগাডন যুদ্ধ হিসেবেও পরিচিত, যেখানে সিরিয়ার দামাস্কাসে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে বড় ধরনের একটি যুদ্ধ হবে। ইসলামিক ভবিষৎবাণী অনুযায়ী, ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার পর অবশেষে মুসলিমরা যুদ্ধে জয় লাভ করবে।

অধ্যায় ১০: (স্পেশাল)

পূর্ব থেকে কালো পতাকা’র আগমন

বর্তমান বিশ্বে যে লড়াইগুলো চলছে তার মূলকেন্দ্র হল আফগানিস্তান। ওসামা বিন লাদেনের অনুসরণে আল কায়েদা নেতারা মোল্লা ওমরকে তাদের আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) দিয়েছেন।

আল কায়েদা ও তালিবানের মধ্যে যে স্বতন্ত্রতা ছিল তা দূর হয়ে যেতে লাগলো এবং তালিবানের নতুন প্রজন্ম বৈশ্বিক সংগ্রামের জন্য আল কায়েদার কাছে তাদের আনুগত্যের শপথ দিল।

তারা সবাই একই পতাকার নিচে – একটি কাল পতাকা, যেখানে আরবিতে লেখা আছে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)। এই ট্রেন্ড শুধু আফগানিস্তানে সীমাবদ্ধ নয় বরং আল কায়েদার সাথে সম্পৃক্ত সকল দলের একটি কাল পতাকা আছে যাতে শাহাদাহ বাক্য লেখা রয়েছে।

প্রসঙ্গ : পতাকা

কালো এবং সাদা উভয় পতাকাই রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম আর্মিকে একটি কেন্দ্রীয় কম্যান্ডের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে যুদ্ধের মানদণ্ড হিসেবে ব্যাবহার করেছিলেন।

পরবর্তী ইসলামিক প্রজন্মগুলোও কালো ও সাদা পতাকার ব্যাবহার চালু রাখে। (সেই সৈন্যবাহিনীর অনুকরনে যাদের ব্যাপারে হাদিসে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো)। আব্বাসিরা এটা করার চেষ্টা করেছিলো এবং তাদের প্রথম দিকের খলিফাগুলোর কোন একজনকে মাহ্দি বলে সম্বোধন করতেন (মুসলিমদের সেই বহু প্রতীক্ষিত নেতা যিনি মুসলিমদেরকে বিজয়ের দিকে নিয়ে যাবেন।)

বিস্তারিত ইতিহাস

১৯২৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফাহ'র পতন ঘটলো এবং সহজেই 'বিভাজন এবং জয় সূত্র' (Divide and conquer rule) বাস্তবায়নের জন্য একত্রে যুক্ত থাকা মুসলিম রাষ্ট্র বিভক্ত করে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হল। প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন পতাকা নির্ধারণ করা হল এবং দালাল শাসকদের

চাপিয়ে দেয়া হল যারা সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থন করে। কিন্তু তাদের কেউই সেই কাল পতাকা বহন করে না। সেই কাল পতাকা পুনরায় ফিরে আসলো যেমনভাবে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধের সময় সেই পতাকা আবির্ভূত করতেন।

আল কায়েদার লক্ষ্য

আল কায়েদার লক্ষ্য হল সকল মুসলিমকে প্রতিরোধ আন্দোলনে কাল পতাকার নিচে এক করা এটা নিশ্চিত করার মাধ্যমে যে সব প্রতিরোধ আন্দোলনের লক্ষ্য যে কোন জাতীয়তাবাদের এবং সীমান্তের সীমা ছাড়িয়ে যায়। যাতে করে যখন কোন মুসলিম কোন এক ভূখণ্ড থেকে অপর মুসলিমদের ভূখণ্ডে জিহাদ করতে যায় তখন যেন তার গায়ে জাতীয়তাবাদী রং না লাগিয়ে বলা হয় সে অমুক ভূখণ্ড থেকে এসেছে। সবশেষে বলা যায়, জিহাদ বিশ্বব্যাপী এমনভাবে পুনর্জাগরিত হয়েছে যা বলার বাইরে, কেউ এটাকে আটকাতে পারবে না।

প্রতিরোধের ক্ষমতা অর্জন

আল কায়েদার লক্ষ্য কোন সাধারণ ইসলামিক প্রতিরোধ করা নয় বরং তা হল পুরো বিশ্বব্যাপী জিহাদ ছড়িয়ে দেওয়ার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা। সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্রে তারা যেকোন মুসলিমের (অনেক সময় অমুসলিমদের সাথেও) সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়, তারা তাদের অর্থ,অস্ত্র,মানুষ ও গেরিলা কৌশল শিখানোর মাধ্যমে সাহায্য করেন, তাদের মন- প্রান জয় করেন এবং ধীরে ধীরে একটি সংগঠনকে ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য তৈরি করা। তারা এমনটি আফগানিস্তানে তালিবানদের ক্ষেত্রেও করেছিলেন এবং বর্তমানে তারা চীন (তুর্কমেনিস্তানে উইঘুর মুসলিম), ফিলিপাইন, সিরিয়া, আফ্রিকা, চেচনিয়া, উজবেকিস্তানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পৌঁছে গেছেন।

অস্থায়িত্ব বেঁধে রাখার কৌশল

এই কৌশলটি জায়নিস্ট ও বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপ ব্যাবহার করে। এই কৌশল ব্যাবহার করার মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়, এরপর এমনভাবে ওই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হয় যেন তারাই ত্রাণকর্তা এবং এরপর তারা তাদের স্বার্থ অনুযায়ী কোন একটা অবস্থা তৈরী করে, গ্লোবাল পুলিশ ফোর্স বা বিগ ব্রাদার স্টেট তৈরি করার মাধ্যমে মানুষকে দাসে পরিনত করে।

ইচ্ছাকৃত ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা → হস্তক্ষেপ করা → স্বার্থ অনুযায়ী উত্তরনের পরিস্থিতি ঠিক করা।

মুসলিম বিশ্বে অত্যাচারী শাসনকে অস্থিতিশীল করার জন্য আল কায়দা এই কনসেপ্টটি অনুসরণ করেছে এবং কিছুটা সফলও হয়েছে। যেসব মানুষ আধুনিক যুদ্ধাবস্থা ও রাজনীতির প্রকৃতি সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখে না তারা এটাকে "মূর্খ চরমপন্থিদের" এলোমেলো বিস্ফোরণ হিসেবে দেখে।

আল কায়েদার পরিকল্পনা হল এমন এক অস্থিতিশীল বিশ্ব তৈরি করা যেখানে জায়নিস্ট্ররা সহজে মানুষের উপর আধিপত্য করতে পারবে না। (জায়নিস্ট প্রভাব দ্বারা পশ্চিমা বিশ্ব এমনভাবে ডমিনেটেড যেন এটি বিশ্বের সবচেয়ে স্থিতিশীল ও সরকার নিয়ন্ত্রিত অংশও)

যদি কার কাছে বিশ্বের বেশীরভাগ সম্পদ হাতের মুঠোয় থাকে তবে তার জন্য সরকারকে ঘুষ দেওয়া অতি সহজ। জায়নিস্টরা এই ব্যাপারটিতে এমন ব্যাপকভাবে দক্ষতা লাভ করেছে যে পশ্চিমারা জানলো এই "বড় ভাইগুলো" পরিকল্পনা করছে কিন্তু অসহায়ত্ব অনুভব করছে যেহেতু তারা এটা থামাতে পারছে না। (আপনারা Minority Report মুভিটা দেখতে পারেন, যেখানে এই "বড় ভাই" নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব নিয়ে প্রিভিউ করা হয়েছে)

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বা নতুন বিশ্ব ব্যাবস্থা গঠনের ক্ষেত্রে তিনটি শক্তি

জেরুজালেম সম্পর্কিত বিশ্বে তিনটি শক্তি দেখা যায় –

(১) ইউরোপীয় ইউনিয়ন – আধুনিক ক্রুসেডার,

(২) খুরাসানের মুসলিমরা (গ্রেটার খুরাসান) এবং মধ্য প্রাচ্য,

(৩) নব্য রক্ষণশীল খ্রিস্টান যারা জায়নিস্টদের সাথে মৈত্রীত্ব স্থাপন করেছে (জায়নিস্টরা একজন ইহুদি রাজার জন্য অপেক্ষা করছে, যাকে মুসলিমরা দাজ্জাল বা অ্যানটি- খ্রিস্ট হিসেবে চিনে)

(১) ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আধুনিক ক্রুসেডার দস্যুরা এবং ইসলাম মেনে চলা মুসলিমদের প্রতিবন্ধকতা

ইউরোপিয়ানরা দিনকে দিন গরিব, তিক্ত ও সহিংস হচ্ছে ক্রেডিট ক্রাঞ্চ আর কঠোর ব্যবস্থার কারনে যারা জনগনের টাকা দিয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিল। (প্রথম স্থানে আছে জায়নিস্ট ব্যাংকগুলো যারা তাদের নিজেদের জনগনের সাথে প্রতারণা করেছিলো)।

ইউরোপিয়ানরা তাদের এই দরিদ্রতার আক্রোশ কারও উপর ঝারতে চাচ্ছিল। জায়নিস্ট মিডিয়া তাদের কাছে মুসলিমদেরকে তাদের এ অবস্থার জন্য দায়ী বর্ণনা করে তাদের শত্রুতে পরিনত করলো। সেখানকার জনগণ সেখানকার প্র্যাকটিসিং মুসলিমদের উপর তাদের আক্রোশ প্রকাশ করলো, জনগণ তাদের সাথে শত্রুতাপূর্ণ আচরণ শুরু করলো এবং তাদের ভুমি থেকে মুসলিমদের বিতারিত করতে চাইল।

ইউরোপিয়ান মিডিয়া সুযোগ কাজে লাগাল এবং নতুন প্রচারণা শুরু করলো । তারা উদারভাবে “ক্রুসেড” শব্দটি ব্যাবহার করার মাধ্যমে জনগণকে ১০০০ বছরের পুরনো মানসিকতার দিকে নিয়ে গেল যে তাদেরকে মধ্য প্রাচ্যের “বেদুইন” মুসলিমদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ করতে হবে।

ক্রুসেডের মতো শব্দটি অত্যন্ত সুক্ষ এবং প্রায়ই স্পোর্টস ক্লাবগুলোতে এটি ব্যাবহার করা হয় যা তাদের জাতিগত গর্বকে বাড়িয়ে দেয় ; অথবা রূপক অর্থেও ব্যাবহার করা হয়। কিন্তু এর পুনঃব্যাবহার এমন একটি মানসিক কসরতের দিকে ইঙ্গিত করে যার দ্বারা ইউরোপিয়ানদের সেই হাজার বছরের পুরনো মনভাবের (মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ) দিকে নিয়ে যায়।

অনেক পশ্চিমা দেশের আর্মিদের অস্ত্রে বাইবেলের চরন খোদাই করা থাকে যা তাদের মধ্যে এই মনোভাব সৃষ্টি করে যে তারা একটি পবিত্র যুদ্ধ পালন করছে। ২০১২ এর মধ্যবর্তী সময়ের এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, মার্কিন আর্মি ইন্সটিটিউট তাদের সৈন্যদের ইসলামের বিরুদ্ধে গ্লোবাল যুদ্ধ শিক্ষা দিচ্ছে এবং পবিত্র

কাবা শরিফে বোমা নিক্ষেপের ব্যাপারেও তাদের শিক্ষা দিচ্ছে। যদিও পরবর্তীতে এটা সেখানকার প্রশিক্ষকরা প্রত্যাখ্যান করে।

যেটাই হক না কেন – দারিদ্রতা, তিক্ততা, অভিবাসী প্র্যাকটিসিং মুসলিমদের টার্গেট করা এবং বস্তুবাদের পরিবর্তে খ্রিস্টিয়ানিটি তাদের মাঝে স্থান করে নেওয়া ; এসন কারনে ইউরোপিয়ানদের মধ্যে ক্রুসেডার মানসিকতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই ক্রুসেডের উদ্দেশে পুরো ইউরোপ জুড়ে বিভিন্ন গ্রুপ গঠন (যেমন ব্রিটেনে EDL ও BNP এবং ইউরোপ জুড়ে এ ঘরনের আরও অনেক গ্রুপ) করা ছাড়াও আরও যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে ইউরোপ ক্রমান্বয়ে ইসলাম বিরোধী হচ্ছে।

এই গ্রুপগুলো মুসলিমদেরকে চাপ দিবে তাদের ইসলামিক ব্যক্তিত্ব (দাড়ি, হিজাব ইত্যাদি) ছেড়ে দিতে নতুবা তারা মুসলিমদের অপমান করবে এবং তাদের ব্যাপারে সহিংসতা অবলম্বন করবে। মুসলিমরা যখন রাষ্ট্র কতৃপক্ষের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করবে তখন তারা এই ব্যাপারটাকে এ হিসেবে বিবেচয়া করবে যে "বাইরের লোকেরা সবসময় অভিযোগ করে।"

এরা সেই দস্যু প্রকৃতির গ্রুপ যারা বেশীরভাগ আধুনিক ক্রুসেড আর্মি দ্বারা গঠিত।

যেহেতু অস্থিতিশীল মধ্য প্রাচ্য পশ্চিমা অর্থনৈতিক আধিপত্য থেকে এখন স্বাধীন হতে যাচ্ছে (সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো থেকে মুসলিম বিশ্বকে মুক্ত করার জন্য আল কায়েদার অভিযানের কারনে) – ধনী লোকগুলো ইউরোপিয়ান জনগণকে আধুনিক ক্রুসেডে যোগদানে উৎসাহিত করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে (গত সহস্রাব্দের হাজার বছরের পুরনো ক্রুসেডের মতো করে)।

আধুনিক ক্রুসেডটি মালাহামা বা আরমাগেডন যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাবে যা কিনা মুসলিম ও খ্রিস্টান উভয়ের কাছেই ভবিষৎবাণী জানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো এবং সেটা হবে সিরিয়ার দামেস্কাসে।

(২) মুসলিমদের বিরুদ্ধে স্পেনিশদের আধুনিক Inquisition (দ্বাদশ শতকে ফ্রান্সে ব্যবহৃত রোমান ক্যাথলিকদের জবরদস্তিমূলকভাবে তাদের বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়ার পন্থা) –"চিন্তাগত সন্ত্রাস"

পশ্চিমে বসবাসকারী মুসলিমরা এমন উভয়সংকটের মধ্যে আছে যা এর আগে দেখা যায়নি। তাদেরকে "সন্দেহজনক নাশকতামূলক বিশ্বাসের" কারনে মিথ্যা সন্ত্রাসী মামলায় আটক করা হয়।

এই প্রবণতা গত কয়েক বছর ধরে বেড়ে যাচ্ছে যতক্ষণ না পর্যন্ত মুসলিমরা হয় কুরআনকে পরিপূর্ণ ভাবে ত্যাগ করে অথবা তারা চুপচাপভাবে মুসলিম ভূখণ্ডে হিজরত করে অথবা ইউরোপে থেকেই নির্যাতনের মুখোমুখি হয়, যেমনটা স্পেনে স্প্যানিশ মুসলিমদের তল্লাসি করার সময় হয়েছিলো।

১ নাম্বার পয়েন্টে উল্লেখ করা পশ্চিমা সরকারের অভিজাত দস্যুরা কিছু আইন প্রণয়ন করেছে যেমন সন্ত্রাসমূলক আইন (ইংল্যান্ড) অথবা দেশপ্রেম মূলক বিধান (আমেরিকা) যেখানে যেকাউকে সন্ত্রাসী মনে করে আটক করা যাবে এবং কারাগারে পাঠানো যাবে এমনকি অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদের কোথাও স্থানান্তরও করা যাবে নিরজন কারাবাসের ভগের জন্য।

যেসব পশ্চিমা মুসলিমরা মুসলিম বিশ্বে হিজরত করে তারা সেখানেও অস্থিতিশীলতার সুম্মুখীন হয়, কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বে থাকার সময় এরা এর থেকে তুলনামূলক আরও বিপদজনক অবস্থায় থাকে।

যেসব মুসলিমরা মুসলিম ভূখণ্ডে হিজরত করে তারা দেখতে পায় যে জেরুজালেমকে দখল করে নেওয়া হয়েছে এবং সোলায়মান মন্দির (Sulaiman Temple) স্থাপনের জন্য মসজিদুল আকসা ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ভবিষ্যতে মুসলিমদের বিজয় এবং জেরুজালেম মুক্ত করার ব্যাপারে এটিই প্রথম নিদর্শন।

(৩) নব্য রক্ষণশীল খ্রিস্টান ও জায়নিস্ট ইহুদি মৈত্রীত্ব :

ইহুদিরা প্রায় ৩০০০ বছর ধরে পবিত্র জেরুজালেমে পুনঃ প্রবর্তন করতে চাচ্ছিল।

খ্রিস্টানরা প্রায় ২০০০ বছর ধরে ঈসা (আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ফিরে আসার জন্য অপেক্ষায় আছে।

কিন্তু এরা উভয়ই একে অপরের শত্রু। খ্রিস্টানরা জায়নিস্টদের সাথে একারনে মৈত্রীত্ব স্থাপন করেছে যে তারা সর্বশেষ মাসিয়াহ'র জন্য অপেক্ষা করছে।

এই জায়নিস্টরা ৩ ধাপে তাদের মাসিয়াহ'র আগমনের জন্য অপেক্ষা করছে :

(ক) ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, যার রাজধানীহবে জেরুজালেম। (ইতিমধ্যে হয়ে গেছে)

(খ) মসজিদুল আকসায় আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে এবং সোলায়মান মন্দির স্থাপনের মাধ্যমে, যেখানে তাদের মাসিয়াহ দাজ্জাল (অ্যান্টি- খ্রিস্ট) বাস করবে (প্রায় সমাপ্তির পথে)

মসজিদুল আকসা নবী সোলায়মান (আ'লাইহি ওয়া সালাম) নির্মাণ করেছিলেন, কিন্তু ইহুদি ও খ্রিস্টানের এটিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে বলে যে এই একটি জাদুর মন্দির এবং তারা নবী সোলায়মান (আ'লাইহি ওয়া সালাম) কে নবী হিসেবে স্বীকার না করে রাজা হিসেবে স্বীকার করে।

(গ) মিথ্যা মাসিয়াহ'র আগমন, যে হল ইহুদিদের বহু প্রতিক্ষিত ইহুদি রাজা (যাকে খ্রিস্টানরা জেসাস হিসেবে অভিহিত করে)। কিন্তু এই রাজা হবে অ্যান্টি- ক্রাইস্ট, এক জন এক চোখা মিথ্যাবাদী (দাজ্জাল অর্থ হল এমন

একজন যে কিনা সবসময় মিথ্যা কথা বলে এবং প্রতারণা করে)। সে নতুন বিশ্ব ব্যাবস্থার (New World Order) নেতা হবে এবং তার নেতৃত্বে থাকা সরকার দিয়ে সে পুরো বিশ্ব চালনা করবে (মক্কা ও মদিনাতে সে প্রবেশ করতে পারবে না)

<u>মসজিদ আল আকসাকে সোলায়মান মন্দির দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হবে</u>
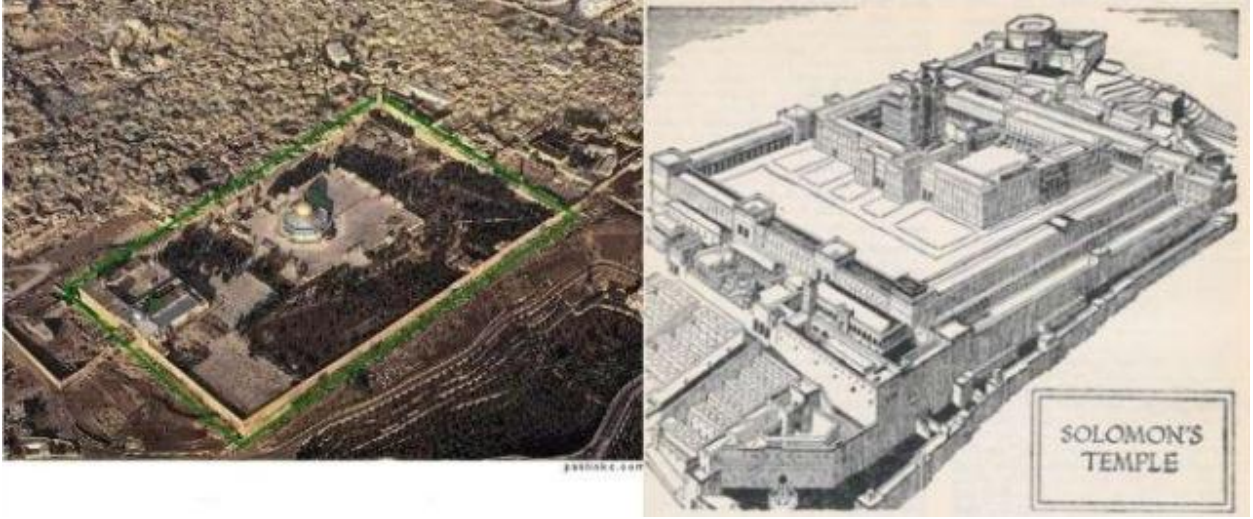
মসজিদ আল আকসার পুরো অংশ (সবুজ বর্ডারসহ পুরো আয়তাকার এলাকা এর অন্তর্ভুক্ত – আসল মসজিদটি এত বড় যে সেখানে কোন বিল্ডিং নেই)।

আমেরিকার পতনে ইসরাইলের কিছু যায় আসে না। কারন জায়নিস্ট ইসরাইলকে প্রতিষ্ঠার জন্য আমেরিকাকে ব্যাবহার করা হয়েছে - জায়নিস্টদের আসল লক্ষ্য ছিল মসজিদ আল আকসাকে প্রতিস্থাপন করে তারা নতুন সোলায়মান মন্দির স্থাপন করবে (এর কারনে তাদেরকে মসজিদ আল আকসা ধ্বংস করতে হবে)। কিন্তু আল কায়েদা এই ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন। তাদের লক্ষ্য হল আমেরিকার ইন্টারেস্টগুলোকে টার্গেট করা শুধুমাত্র এই কারনে যে এর ফলে ইসরাইলের মেরুদণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নিকটবর্তী শেষ সময় আসার আগে তারা এটার মুখোমুখি হয়।

জায়নিস্ট রাষ্ট্র ইসরাইল এই ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন যে আমেরিকার পতন হচ্ছে। তারা বিশ্বকে নতুন এক বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত করছে যেখানে হিব্রু হবে প্রধান ভাষা (যাতে এখন যেমন তাদেরকে “অ্যান্টি-সেমিটিক” জাতীয় শব্দ দিয়ে তাদেরকে মানুষ চেনে, পুরো বিশ্বে তাদের আধিপত্য স্থাপিত হলে যাতে সবাই চুপ হয়ে যায়)।

ক্রেডিট কার্ডের মতো বেসিক বিষয়গুলো টাকার বদলে ব্যাবহার করা হয় যাতে জায়নিস্টরা এর মাধ্যমে জনগণকে তাদের দাসে পরিনত করতে পারে। এর ফলে, যদি কেউ তাদের অমান্য করতে চায় – তারা ওই ব্যক্তির ক্রেডিট কার্ডের ব্যাল্যান্সকে শূন্য করে দিবে এবং সে কোন দারিদ্রতার মুখোমুখি হবে। এটি জনগণকে সত্যিকার অর্থে দাস বানিয়ে রাখা।

যারা অন্ধভাবে এর দাসত্বের শিকার হবে তারা হল অনারব এবং খুরাসান ব্যতীত অন্যান্য যোদ্ধারা কারন তারা তাদের প্রতিদিনের খাবার কেনার জন্য ক্রেডিট কার্ডের উপর নির্ভর করে। অন্যদিকে মুসলিম ভূখণ্ডগুলো অস্থিতিশীল (জায়নিস্ট কতৃক কম শাসনযোগ্য), তাই এই মুসলিমরা যারা তাদের নিজেদের খাবার উৎপাদন করে তারা তাদের থেকে মুক্তভাবে টিকে থাকতে পারবে তাদের তুলনায়, যারা ক্রেডিট কার্ড ভিত্তিক অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল।

কালো পতাকার ভবিষৎবাণী – ঘটনার ক্রম

আহমেদ বর্ননা করেছেন যে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, “রাসুল(স) বলেছেনঃ”খোরাসান হতে কালো পতাকা ধারী লোক বের হবে যাদেরকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না যতক্ষন না তারা আলিয়ায় বিজয় পতাকা ওড়াবে।”

‘আলিয়া’ বাইতুল মাকদিসের প্রাচীন রোমান নাম। তৎকালীন খোরাসান ছিল বর্তমান আফগান ও পূর্ব ইরান।

ইহুদী ধর্মগ্রন্থে ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও যোদ্ধাদের বর্ননা

দুর্নীতিগ্রস্ত জেরুজালেমর বিরুদ্ধে ঈশ্বরের পরিকল্পনাঃ

এগুলো হচ্ছে সেই কথা যা স্বর্গীয় সেনাবাহিনীর প্রভু বলেছেনঃ আঘাত দিয়ে ভাঙ্গার যন্ত্র তৈরির জন্য গাছ কাট। জেরুজালেমের প্রাচীরের বিরুদ্ধে ঢালু রাস্তা তৈরি করো। এই সেই শহর যার শাস্তি হবে, সে সম্পুর্নরূপে পাপিষ্ঠ বলে। (জেরেমিয়াহ ৬:৬)

আল্লাহ কেন জায়নিস্টদের শাস্তি দিচ্ছেন ?

তারপর প্রভু আমাকে বললেন, ইসরাইলের জনগনের উপর এটা শেষ হবে। এরপর আমি আর কখনই উপেক্ষা করে যাবনা (কারণ তারা প্রভুর চুক্তি ভেঙেছে ও পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে)। সেই দিন গির্জার সংগীতের পরিবর্তে বিলাপ শুরু হবে, অনেককেই ছুড়ে ফেলা হবে সর্বত্র। (আমোস ৮ : ২,৩)

ঈহুদী ধর্মগ্রন্থের ওল্ড টেস্টামেন্টে এই সেনাবাহিনীর বর্ননা করা হয়

“দেখ, একদল লোক আসছে উত্তর দিকের দেশ থেকে,(ইসরাইলের উত্তরে মুসলিম দেশ সমুহ(ইরাক, আফগান, মিশর ও অন্যান্য) ইসরাইল দ্বারা নিপীড়িত) এবং একটি মহান জাতি পৃথিবীর সুদূরতম অংশ থেকে উত্থাপিত হবে। তারা তীর ধনু ও বর্শা বহনকারী হবে। তারা নিষ্ঠুর ও দয়াহীন হবে ; তারা সমুদ্রের মত গর্জন করবে।(যখন মুসলিমরা এক সাথে আল্লাহু আকবর বলে [আল্লাহ মহান]) তারা অশ্বারোহী হবে।যেহেতু যোদ্ধারা তোমাদের দিকে নিক্ষেপ করবে। ও, ঈহুদীবাদীর কন্যা। (জেরেমিয়াহ ৬: ২২,২৩)

একজনের হুমকিতে এক হাজার ঈহুদিবাদী পালিয়ে যাবে। পাচজনের হুমকিতে তুমি পালিয়ে যাবে। যতক্ষন না তুমি পোল অথবা ব্যানার হিসেবে ছাড়া পড়ে যাবে।(ইসায়ীয়াহ ৬:২৬-৩০)

শিঙ্গায় ফু দেয়া ও সতর্কবার্তা বাজানো হবে পবিত্র পর্বতে! ভুমির সমস্ত মানুষ প্রকম্পিত হতে থাকবে প্রভুর আগমনের জন্য; অবশ্যই এটা নিকটবর্তি, এমন দিন অন্ধকার ও বিষাদের, এমন দিন হতাশার। যেভাবে ভোর হয় সেভাবে পর্বত থেকে একটি শক্তিশালী ওঃ অপারাজেয় সেনাবাহিনী নেমে আসবে যা আগে কখনই হয়নি। (জোএল ২:১-৯)

ইসলামে কালো পতাকা বাহী সেনাবাহিনীর বর্ননা

আব্দুল্লাহ ইবন হাওয়ালাহ (রা.) আল্লাহর রাসুল (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে উনি বলেছেনঃ "পরিস্থিতি তার কাজের ধারা অনুযায়ী চলতে থাকবে যতক্ষণ না তোমরা তিনটি বাহিনীতে পরিণত হওঃ একটি বাহিনী শামের, এবং একটি বাহিনী ইয়েমেনের আর আরেকটি ইরাকের।"ইবন হাওয়ালাহ (রাঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ)! যদি আমি সেই দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকি তবে আমার জন্য একটি নির্ধারন করে দিন।" আল্লাহর রাসুল(সাঃ) উত্তর দিলেন, "তোমার শামে যাওয়া উচিত হবে কারন এটি আল্লাহর ভূমিদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম, এবং উনার সবচেয়ে ভাল বান্দারাই সেখানে জড়ো হবে! এবং যদি তুমি তা না চাও তবে তোমার ইয়েমেনে যাওয়া উচিত এবং সেখানকার কূপ থেকে পানি পান করা উচিত। কারন আল্লাহ আমাকে নিশ্চিত করেছেন যে উনি শাম এবং তার মানুষের উপর খেয়াল রাখবেন!"

(ইমাম আহমেদ ৪/১১০, আবু দাউদ ২৪৮৩)

হাদিস অনুসারে তিনটি সেনাবাহিনী তৈরি হবে, যার মধ্যে একটি সেনাবাহিনী

১) শামে

২)ইরাকে

৩)ইয়েমেনে

অপরটি খোরাসানে (আফগানস্থান ও তার চারপাশে) যদিও এই ব্যাপারে মতানৈক্য আছে, পৃথিবীর সবাই এই বাস্তবতা অনুভব করেছে)

আল কায়েদা ও তার সহযোগী সংগঠন গুলো আজ চারটি জায়গাতেই উপস্থিত

ইরাকঃ ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক

শামঃ জাহবাত আল নুসরাহ

ইয়েমেনঃ আনসার আল শারিয়াহ

খোরাসানঃআল কায়েদা কেন্দ্রীয়, তালেবান ও বিভিন্ন সহযোগী সংগঠন ।

এদের সবাই যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের দোসরদের সাথে লড়াই করছে , সিরিয়া ব্যতীত । যেহেতু এই বইটা ২০১২ সালের নভেম্বরে লেখা, জাহবাত আল নুসরাহ অফিসিয়ালী ঘোষনা করেছে তারা একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছে । যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো সঠিক সময়ের অপেক্ষা করছে যাতে তারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম না হয় । যদি তারা আক্রমনের চেষ্টা করে তবে জাহবাত আল নুসরাহ ইসলামী স্টেট অফ ইরাকের মত পরিকল্পনা গ্রহন করবে ।

আল কায়েদার এই গ্রুপগুলো এতদিনের যুদ্ধের বছরগুলোতে লড়াই করে যাচ্ছে , এটা অসম্ভব তাদেরকে সরিয়ে দেয়া, কারন তারা সবাই স্বাধীন ভাবে শুধুমাত্র আদর্শের ভিত্তিতে একত্রিত হয়েছে । এমনকি তাদের একটি নির্দিষ্ট জায়গা আছে , যদিও তাদের পাহাড় পর্বতে লুকাতে হয় ।

ভবিষৎবাণীকৃত ইয়েমেনের আবিয়ানে ১২,০০০ মুসলিম যোদ্ধা এখন জড় হচ্ছে

আহমাদ থেকে বর্ণিত, ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে রাসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “ আল্লাহ্ ও তার রাসুলকে সাহায্য করার জন্য ‘আদেন আবিয়ান থেকে বার হাজার লোক বের হয়ে পড়বে, যারা আমার এবং তাদের সময়ের মধ্যে সর্বোত্তম লোক।”

ইয়েমেনের আনসার আল শারিয়াহ (AQAP) ‘আদেন আবিয়ান প্রদেশে অবস্থান করছে এবং ইতিমধ্যে তাদের বার হাজার লোক বিশিষ্ট এক আর্মি গঠন করা হয়েছে, ঠিক যেমনটি রাসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন।

হিন্দুস্তান আক্রমণের ব্যাপারে ভবিষৎবাণী

খোরাসান আর্মি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “ আমার উম্মতের মধ্য থেকে একদল লোক হিন্দুস্তান আক্রমণ করবে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে বিজয় লাভ করতে সাহায্য করবেন। তারা হিন্দুস্তানের রাজাকে

শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবে। আল্লাহ্ তাদের সব গুনাহকে ক্ষমা করে দিবেন। এরপর তারা শামের (বৃহত্তরর সিরিয়া) দিকে যাবে এবং সেখানে তারা ঈসা ইবন মারইয়ামকে পাবে।"

নোট : ইমাম মাহদি ও ঈসা (আ'লাইহি ওয়া সালাম) এর মধ্যবর্তী সময়ের ব্যাপারটা প্রকৃতিগতভাবেই অস্পস্ট। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে ইমাম মাহদি প্রথমে আসবেন এবং এরপর আসবেন ঈসা (আ'লাইহি ওয়া সালাম)। বর্তমান বিশ্বের অবস্থা ও ঘটনাবলী ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে অনেক সম্মানিত চৌকস আলেমগণ ধারণা করছেন যে ইমাম মাহদি ইতিমধ্যে জন্মগ্রহন করেছেন এবং শীঘ্রই তিনি ইসলামের বিজয়ের জন্য কর্মরত বিভিন্ন হক্বপন্থী দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করবেন।

ইন্ডিয়ার প্রতি আল কায়েদার আক্রমণের হুমকি (২০০৮ এ মুম্বাই আক্রমণের কারনে) হল ইন্ডিয়া আক্রমণের ভবিষৎবাণীর একটা অংশ

খোরাসানের তালিবানদের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই তাদের লক্ষ্য হল ইন্ডিয়া। পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর গরিলা বিশেষজ্ঞ ইলিয়াস আল কাশ্মীরি তালিবান, লস্কর ই তাইয়্যেবা ও আল কায়েদাকে উৎসাহিত করেছে ইন্ডিয়াতে যুদ্ধ শুরু করার জন্য। কিন্তু তিনি কেন ইন্ডিয়াকে পছন্দ করলেন ?

মার্কিনদের শক্তিশালী মিত্র পাকিস্তান আর্মি যারা আল কায়েদা ও তালিবানদের বিরোধী, তারা ইন্ডিয়াতে ২০০৮ এ ওই হামলার সময় সর্বচ্চোভাবে সতর্ক ছিল। ইন্ডিয়া এসময় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রায় যুদ্ধ শুরু করতে যাচ্ছিলো কারণ, তাদের অভিযোগ ছিল পাকিস্তান প্রক্সি আক্রমণ হিসেবে এটি লস্কর ই তাইয়্যেবাকে দিয়ে করিয়েছে।

এই বিশাল হুমকির কারনে পাকিস্তান পাক-আফগান বর্ডারে চলা আর্মিদের সাথে তালিবানদের যুদ্ধ থামিয়ে দেয় এবং তালিবান ও আল কায়েদাকে পুনর্গঠনে বাধা না দিয়ে আর তাদেরকে তাদের অভ্যুত্থানের ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়ে ইন্ডিয়ার সাথে ফুল স্কেল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। আল কায়েদা ও তালিবান এই ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে যদি পাকিস্তান ইন্ডিয়ার সাথে যুদ্ধ করে তবে তারা সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের পক্ষ হয়ে লড়বে। আমেরিকা ব্যাপারটা ভাল মতো আঁচ করলো এবং ইন্ডিয়াকে দ্রুত এ ব্যাপারে থামিয়ে দিল এটা বলে যে ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানের মধ্যকার যুদ্ধে শুধুমাত্র আল কায়েদা ও তালিবান লাভবান হবে।

আল কায়েদা জানে যে ইন্ডিয়াতে আক্রমণ করতে থাকলে ইন্ডিয়া পাকিস্তানকে তার আফগান বর্ডারে "সন্ত্রাসীদের লালন-পালনের" জন্য আক্রমণ করবে। পাকিস্তানও এ আক্রমণের প্রতিশোধ নিবে এবং আল কায়েদা ও তালিবান তাদের মুসলিম প্রতিবেশীদের এমনকি বাংলাদেশকেও (আরেকটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিবেশী) সাহায্য করবে।

এই পুরো আঞ্চলিক যুদ্ধ হবে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম বনাম হিন্দু যুদ্ধ। সবশেষে মুসলিমরা এই যুদ্ধে জয়ী হবে যেমনটা রাসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন হাদিসের মাধ্যমে। আর সেই মুজাহিদদের পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে (ফলে তারা জান্নাত লাভ করবে)।

জেরুজালেমের মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

খোরাসান (বৃহত্তর আফগানিস্তান) থেকে আসা কালো পতাকাধারী সৈন্যরা সিরিয়ার দিকে মার্চ করবে এবং ইমাম মাহদির অধীনে থাকা সিরিয়ার মুজাহিদের সাথে যোগ দিবে আর ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে (তা কতদিন পর্যন্ত চলবে তা আল্লাহই ভাল জানেন) যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদেরকে একটি দুর্গে অবরোধ করে রাখে। এরপর দাজ্জাল নতুন বিশ্ব ব্যাবস্থার রাজা হিসেবে আবির্ভূত হবে। জায়নিস্টরা এ ব্যাপারে অপেক্ষা করছে কারন তারা জানে দাজালকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। কিন্তু কিছু সময় পরেই তারা ঈসা (আ'লাইহি ওয়া সালাম) কে পাবে যিনি দুনিয়াতে স্বর্গ থেকে অবতরণ করবেন। কাল পতাকাধারী যোদ্ধারা তখন জেরুজালেমে পৌঁছাবে এবং সত্য মাসিয়াহ ঈসা (আ'লাইহি ওয়া সালাম) হত্যা করবেন মিথ্যা মাসিয়াহ দাজ্জালকে, কারন তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ সামর্থ্য দিবেন দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য। এরপর তারা অবৈধ ইসরাইলকে পবিত্র শহরে রুপান্তর করবেন, মসজিদ আল আকসার পুনর্গঠন করবেন যা (সুলায়মান আ'লাইহি ওয়া সালাম কতৃক নির্মিত হয়েছিল) এবং আল্লাহ্ তার অঙ্গীকার পূরণের জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন।

ইহুদিদের ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুযায়ী এটা হবে তাদের কৃতজ্ঞতা সুচক প্রার্থনা

"আল্লেলুজা ! দাসত্ব,মহিমা,সম্মান ও ক্ষমতা আমাদের প্রভুর জন্য। তার রায় হল সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ কারন তিনি সেই পতিতাকেও বিচার করেছেন যে ব্যভিচারের মাধ্যমে পৃথিবীতে পাপ ছড়িয়েছে; এবং তিনি তার উপর প্রতিশোধ নিয়েছেন তার দ্বারা যে রক্ত পতিত হয়েছিলো।" (বাণী:১৯ : ১-২) *

(সাফার আল হালাওয়ী তার The day of Wrath বইতে বলেছেন জে এই পতিতা হল আমেরিকা ও ইসরাইল তারা বিশ্বে পাপাচার ও অশ্লীল কর্মের বিস্তার ঘটিয়েছে এবং এই দুই জাতি প্রচুর পরিমানে মুসলিমদের রক্ত ঝরিয়েছে, জেরুজালেম জয়ের পর তারা মুসলিমদের রক্ত প্রবাহিত করে।)

"সেই সময়টাতে আমি মানুষের কথাবার্তাকে বিশুদ্ধ করে দিব যাতে তাদের সবাই তাদের প্রভুর গুণগান করে এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাঁর পরিসেবা করে।" (জাপহানিয়াহ, ৩: ৯)

("শাকাম" অর্থ কাঁধ, এখানে জামাতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সালাতের কথা বলা হয়েছে)

এটি কখন ঘটতে পারে ?

অনেক ইসলামিক স্কলার (যেমন সাফার আল হালাওয়ি তাঁর বই "The Day of Wrath" এ) এবং অন্যান্য ধর্মের বুদ্ধিজীবীরা ২০১২ কে পৃথিবীর শেষ সময় বলে ভবিষৎবাণী করেছিলেন। তারা বলেছেন যে যদি ২০১২ তে পৃথিবীর ধ্বংস না হয় তবে এটা শেষ সময়ের শুরু হবে।

আফগানিস্তান, সোমালিয়া ও ইয়েমেনে আল কায়েদা গ্রুপগুলো লোহিত সাগর দিয়ে পশ্চিমা তেল সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে এবং সেই সাথে গত কয়েক বছর ধরে প্রধান প্রধান কাঁচামাল যা পশ্চিমা সৈন্যদের কাছে পরিবহন করা হতো তাঁর পথ ও বন্ধ করে দিয়েছে। আল কায়েদার পরিকল্পনাকারীদের মতে ২০১২ তে পশ্চিমা সৈন্যরা আফগানিস্তান ত্যাগ করবে। ২০১২ েের নভেম্বরের প্রথম দিকে আফগানিস্তান থেকে ফ্রান্স ও ব্রিটিশ ফোর্স প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, এটা আল কায়েদার পরিকল্পনার সফলতার একটা অংশ।

দখলদার সৈন্য সম্পূর্ণভাবে আফগানিস্তান ত্যাগ করলে (আগামী কয়েক মাস বা বছরের মধ্যে) তালিবান এবং আল কায়েদা আফগানিস্তান থেকে জেরুজালেমের দিকে মার্চ করবে এবং তাদেরকে এটা করা থেকে কেউই আটকাতে পারবে না (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী)।

জেরুজালেমের দিকে মার্চ করার সময় পথিমধ্যে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, কারন তারা ইরাক (ইসলামিক স্টেট অফ ইরাকের মতো আল কায়েদার অন্যান্য শাখাগুলোর সাথে একত্রিত হবে) , এরপর সিরিয়া (সশস্ত্র ইসলামিক অভ্যুত্থানকারীরা) এবং এরপর প্যালেস্টাইনের অন্যান্য মুজাহিদের সাথে এক হবে। আল কায়েদার অন্যান্য শাখাও তাদের সাথে যোগ দিবে যার ফলে তারা এক অদম্য বাহিনীতে পরিণত হবে।

যারাই তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তারা ধংসপ্রাপ্ত হবে।

"এরপর খোরাসান থেকে কাল পতাকা বের হয়ে আসবে এবং এমনভাবে তোমাদের হত্যা করবে যে কখনও এভাবে হত্যা করা হয়নি.....সুতরাং যখন তোমরা তাঁকে (ইমাম মাহদি) দেখবে, তখন তাদের কাছে যাবে এবং তাঁকে বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) দিবে, এমনকি যদি এটা করার জন্য তোমাদের বরফের উপর হামাগুঁড়ি দিয়ে যেতেও হয়। নিশ্চয়ই মাহদি হল আল্লাহর খলিফাহ।" (ইবন মাজাহ)

ম্যাপ

পরিশিষ্ট ১ : আফগানিস্তান-রাশিয়ার যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আল কায়েদার ক্রমবিকাশ (১৯৯০-২০১২)

০ – সৌদি আরব ও মিসর হল আল কায়েদা সদস্যদের আসল দেশ। ওসামা বিন লাদেন সৌদি আরব থেকে এবং আয়মান আল জাওাহিরি মিসর থেকে এসেছেন।

০.৫ – আল কায়েদা সদস্যদের জন্য নিজ দেশ হুমকি স্বরূপ হওয়ার পর তারা সুদানে অস্থায়ীভাবে সুদানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১- সুদান থেকে জরুরি ভিত্তিতে ওসামা এবং তার সাথীরা আফগানিস্তানে ফিরে যান। ওই সময় তালিবানরা আফগানিস্তানের বেশীরভাগ এলাকা জিয় করেছিলেন এবং যুদ্ধ প্রায় শেষের পথে ছিল।

২ – আফগানিস্তানে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে (৯/১১ পরবর্তী) আল কায়েদা তোরা বোরা পাহাড় ও পাক-আফগান বর্ডারে আশ্রয় নেয়।

৩ – অনেক আল কায়েদা সদস্যরা বহির্বিশ্বের সাথে উন্নত যোগাযোগ ও অভ্যুত্থান চালু রাখার জন্য পাকিস্তানের প্রধান শহর করাচীতে চলে যান (২০০২-২০০৫)।

৩.৫ – ইরানে ছোট ছোট আল কায়েদা গ্রুপ ও সেল গঠন করা হয়। আল কায়েদা ও ইরান উভয় পক্ষের উচ্চ পদস্থ বন্দী সদস্য বিনিময় করার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে এবং এই শর্তে আসে যে তারা একে অপরের কোন ক্ষতি করবে না। এর ফলে আল কায়েদা সদস্যরা পাকিস্তান থেকে সরাসরি আফগানিস্তানে এবং ইরানের পথ দিয়ে ইরাকে যেতে পারবে।

৪ – ইরাক : আল কায়েদা সদস্যরা ইরাকে ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ কৌশল শিখল ও যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জন করলো। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় তারা সফল হয়েছিলো। আরবদের মধ্যে ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইরাক ছিল আল কায়েদার জন্য প্রথম টেস্টিং গ্রাউন্ড। বর্তমানে ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক (ISIS) শিয়া নূর মালিকি'র সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে।

৫ – ইয়েমেন : ইরাকের আল কায়েদা যোদ্ধা থেকে যেসব শিক্ষা পাওয়া যায় তা ইয়েমেনে আল কায়েদার নতুন শাখা আল কায়েদা ইন এরাবিক পেনিনসুলা (AQAP) গঠনের ক্ষেত্রে উপকারি হবে। ইরাকের মতই ইয়েমেনে AQAP মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে কারন ভুমি ও সাগরের মধ্যে এটি চরম স্ট্র্যাটেজিক ল্যান্ড।

৬ – সোমালিয়া : আল কায়েদার একটি শাখা হারাকাত আল শাবাব (ইসলামিক ইয়ুথ মুভেমেন্ট) এর আবাসস্থল। ইয়েমেনের মতো সোমালিয়াও একটি চরম স্ট্র্যাটেজিক ল্যান্ড, যেখানে রয়েছে এমন এক সমুদ্রপথ যা ইসরাইল, সৌদি আরব ও অন্যান্য মার্কিন মৈত্রীর কাছে মালামাল আমদানি-রপ্তানির কাজে ব্যাবহার করা হয়। আল কায়েদা সোমালিয়ার জলদস্যুদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হয়েছে, যারা পশ্চিমা কার্গো জাহাজগুল আটক করে সেগুলোর পণ্য যুদ্ধের মুনাফা হিসেবে নিয়ে নেয় অথবা এর বিনিময়ে মিলিয়ন ডলারের মুক্তিপন দাবী করে এবং যেসব জাহাজ আল কায়েদার শত্রুদের কাছে মালামাল যোগান দেয় তাদেরকে বাধা দেয়।

৭ – সিরিয়া : সিরিয়ায় ২০১১-১২ তে অভ্যুত্থান চলাকালীন সময়ে আল কায়েদা শাখা জাবহাত আল নুসরাহ সিরিয়ায় জিহাদের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয় । সিরিয়াতে তাদের ছিল অত্যাধুনিক এবং অভিজ্ঞ গেরিলা ফোর্স যার কারনে সব বিদ্রোহীরা এর উপর নির্ভর করলো কারন বাকি বিশ্বের কেউই সিরিয়ার জনগনের সাহায্যের জন্য করা আর্তনাদের কোন পরোয়া করেনি। পশ্চিমা শক্তিগুলো অন্যান্য বিদ্রোহীদেরকেও সাহায্য করেনি কারন সেগুলোও জাবহাত আল নুসরাহ গোপনভাবে তাদের উপরও প্রভাব ফেলেছিল। এভাবেই সিরিয়াকে পশ্চিমা বিশ্বের প্রভাব থেকে মুক্ত করার মাধ্যমে আল কায়েদা তাদের লক্ষে বিজয়ী হয়েছে এবং মুসলিমদের এটা প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে তারা নিজেরা পশ্চিমা সাহায্য ছাড়াই বিজয় লাভের সামর্থ্য রাখে।

পরিশিষ্ট ২ : খোরাসান থেকে কাল পতাকা – জেরুজালেমের দিকে যাত্রা

আরবের পূর্ব দিকে অবস্থিত খোরাসান (গ্রেটার খোরাসান) থেকে সৈন্যরা বের হয়া আসবে। উপরোক্ত মানচিত্রতে খোরাসান থেকে জেরুজালেমের দিকে যাত্রার বিভিন্ন ধাপ দেখানো হয়েছে এবং আমি সংক্ষিপ্তভাবে কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছি যে প্রত্যেক ধাপে কি কি ঘটতে পারে।

১ – আফগানিস্তান : পশ্চিমা নেতৃত্বাধীন বেশীরভাগ ফোর্স ২০১২ এর শেষের দিকে বা ২০১৩ এর প্রথম অর্ধেকে সময়ের মধ্যে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাবে। আমেরিকাপন্থী আফগান ও পাকিস্তানিরা এটা বুঝতে পারছে। তাই তারাও আর্মিদের সাথে আফগানিস্তানে লড়াই করার আকাংখা থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিয়েছে (কারন তারা জানে তারা মূল্যবান কোন মৃত্যুর জন্য লড়াই করছে না, যা করছে আল কায়েদা ও তালিবানরা)।

২ – পাক-আফগান মৈত্রীত্ব : পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের তালিবানরা এক হয়ে পাকিস্তানীদের নিয়ে সামনে মার্চ করবে। পশ্চিমা বাহিনী প্রত্যাখ্যানের ফলে পাকিস্তানের আর্মির উপর চাপ কমে যাবে এবং তারা এই শর্তে আল কায়েদা ও তালিবানদের সাথে এক হয়ে জিহাদ করবে যে তারা তাদের কমন শত্রু ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

২.৫ – বাংলাদেশে আল কায়েদা ইন্সপায়ারড গ্রুপগুলো পাক-আফগান মৈত্রীর সাথে ঐক্যবদ্ধ হবে।

৩ –ইন্ডিয়ার (আসাম) মুসলিমরা ও মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমরা ইন্ডিয়ান সরকারের কারনে এক কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তারা ইন্ডিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের বন্দী করবে।

৪ – ইরান : ইরানের শিয়ারা মুসলিমদের মধ্যে নতুনরূপে গড়ে উঠা মৈত্রীত্বকে বাধা দিবে (যা আল কায়েদার নেতৃত্বে চলছে)। গত কয়েক বছরে তালিবানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার কারনে ইরানীরা বিলুপ্ত হবে।

৫ – ইরাক : ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক অন্যান্য আল কায়েদা শাখাগুলোর সাথে একত্রিত হয়ে তাদেরকে ইরানের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে (যারা ইরাকের সুন্নিদের জন্য প্রতবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে)।

৬ – সিরিয়া : সিরিয়ার আল কায়েদা আর বিদ্রোহীরা আল কায়েদার শাখাগুলোর সাথে একত্রিত হয়ে তাদের সৈন্য সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করবে। এমন হতে পারে যে এটি আধুনিক ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে মালাহামা (আরমাগেডন) যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ঘটবে।

৭ – তুরস্ক : মালাহামা যুদ্ধে আধুনিক ইউরোপীয় ক্রুসেডাররা মুসলিমদের কাছে পরাজিত হওয়ার মাধ্যমে তুরস্ক কোন যুদ্ধ ছাড়াই মুসলিম সৈন্য কতৃক জয় করা হবে। কামাল আতাতুরক এর সময় থেকে তুর্কিরা ইউরোপীয় প্রভাবের নিচে দীর্ঘ সময় থাকার পর ইসলামে ফিরে যাবে।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদিস থেকে জানা যায়, কোন এক ব্যক্তি চিৎকার করে বলে উঠবে যে দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে। যখন লোকেরা তাদের ভুমিতে ফিরে যাবে তখন তারা বুঝবে যে এটা মিথ্যা ঘোষণা ছিল।

৮ – আরব : মুসলিমরা ইমাম মাহদিকে খোঁজার জন্য মক্কায় যাবেন এবং ইমাম মাহদিকে আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) দিবেন।

৯ – ইয়েমেন : ইয়েমেনিরা ১২,০০০ মুজাহিদ নিয়ে আবিয়ান-'আদন প্রদেশ (AQAP) থেকে আবির্ভূত হবেন, যাদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন তারা হবে "আমার এবং তাদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম মানুষ"। তারা সদ্য গঠিত মাহদি আর্মিকেও সমর্থন করবে।

৯.৫ – মিসর, সোমালিয়া এবং লিবিয়ার আল কায়েদা গ্রুপগুলো মাহদি আর্মির সাথে ঐক্যবদ্ধ হবে।

১০ – ইসরাইল : সদ্য গঠিত আল কায়েদা মাহদি আর্মি জেরুজালেমের দিকে মার্চ করবে এবং সেখানে গিয়ে তারা সত্যিই দাজ্জালকে দেখবে, সে তাদেরকে একটি দুর্গে অবরোধ করে রাখবে (আল্লাহই ভাল জানেন সেটা কত বড়)। দাজ্জাল পুরো বিসশে আধিপত্য করার সময় মুসলিমরা সত্যিকারের মাসিয়াহ ঈসা (আ'লাইহি ওয়া সালাম) এর অবতরণের জন্য অপেক্ষা করবেন। তিনি সিরিয়াতে অবতরণ করবেন এবং লুদ বিমানবন্দরে মিথ্যা মাসিয়াহ

দাজ্জালকে হত্যা করবেন (যেমনটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জানিয়েছেন হাদিসের মাধ্যমে)। লুদ বিমানবন্দরটি ইসরাইলে অবস্থিত একটি মিলিটারি এয়ার ফোর্স ঘাঁটি (যাকে বলা হয় লায়দ্দা)।

বদরের দ্বিতীয় মুজাহিদকে স্বপ্নে ঈসা (আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অতি নিকটেই আগমনের সংবাদে আমরা আশা করতে পারছি যে শীঘ্রই এই ঘটনাগুলো সামনের বছরগুলোতে ঘটতে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের পথে তীব্র প্রতিবন্ধকতা বেশ সাচ্ছন্দেই আসবে – যে জেরুজালেমকে শাসন করে, সে যেন পুরো বিশ্বকে শাসন করলো। মুসলিমরা ঈসা (আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শাসনকালে পুরো বিশ্বে ইসলামের শাসন দেখতে পাবে ফলে পুরো বিশ্বে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করবে। কিন্তু আমরা কি পারব তাদের মধ্যকার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে যাদের এই যুদ্ধে সফলতার ব্যাপারে আগেরকার ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতেও উল্লেখ করা আছে ? আমরা আল্লাহর কাছে দুয়া করি যেন আল্লাহ্ আমাদের ইমাম মাহদি ও ঈসা (আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নেতৃত্বে যুদ্ধের জন্য নিজেদের তৈরি করতে পারি এবং তাদের সাথে কুফফারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পার, আমীন।

লক্ষনীয় ব্যাপার হল এই যে, সব আল কায়েদা শাখা (তালিবান সহ) এই ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে পরবর্তী বছরগুলোতে তাদের আক্রমণের পরিকল্পনাগুলো ঠিক করে রাখছে ও এর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

“অতঃপর যখন আমার শেষ প্রতিশ্রুতির সময় হাজির হল, (তখন আমি আরেক দলকে তোমাদের মোকাবেলার জন্য পাঠিয়েছিলাম) যেন তারা তোমাদের মুখমন্ডল কালিমাচ্ছন্ন করে দিতে পারে, যেমন করে প্রথমবার এ ব্যক্তিরা মসজিদে (আকসায়) প্রবেশ করেছে (এবং এর প্রচুর ক্ষতি সাধন করেছে, আবারও) যেন তারা মসজিদে প্রবেশ করতে পারে এবং যে জিনিসের ওপর তারা অধিকার জমাতে পারে তা যেন তারা ধ্বংস করে দিতে পারে।

সম্ভবত এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করবেন, আর তোমরা যদি (আবার বিদ্রোহের দিকে) ফিরে যাও তাহলে আমিও (আমার শাস্তির) পুনরাবৃত্তি করব, আর আমি কাফেরদের জন্য জাহান্নামকে তাদের (চির) কারাগারে পরিণত করে রেখেছি। ” (সূরা বনী ইসরাইল, ১৭ : ৭-৮)

“ তোমাদের মধ্যে যারা (আল্লাহর উপর) ঈমান আনে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করে, তাদের সাথে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে তিনি জমিনে তাদেরকে অবশ্যই খিলাফাহ দান করবেন যেমনিভাবে তিনি তাদের আগের লোকদের দান করেছিলেন, (সর্বোপরি) যে জীবন বিধান তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন তাও তাদের জন্য (সমাজ ও রাষ্ট্রে) সুদৃঢ় করে দিবেন, তাদের ভীতিজনক অবস্থার পর তিনি তাদের অবস্থাকে (নিরাপত্তা ও) শান্তিতে বদলে দিবেন, (তবে এ জন্য শর্ত এই যে) তারা শুধু আমারই দাসত্ব করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না; এরপরও যে আল্লাহর নিয়ামতের নাফরমানী করবে সেই গুনাহগার (বলে বিবেচিত হবে)। ” (সূরা নূর,২৪ : ৫৫)